হাস্যরস ঃ সাহিত্যে, মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে

HUMOUR :

Effect in Literature, Stage & Screen

Edited by

Dr. Piyali De Maitra

Dr. Prasenjit Chattopadhyay

Sree Chaitanya Mahavidyalaya

হাস্যরস : সাহিত্যে, মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে

Humour : Effect in Literature, Stage & Screen

First Edition : March, 2015

© Sree Chaitanya Mahavidyalaya

Published by
Script
61, Mahatma Gandhi Road.
Kolkata - 700 009

Book Cover & Design
Sri Suvendu Saha, Assistant Professor, Department of Commerce
Sree Chaidanya Mahavidyalaya

Letter Type Setter by :
Bristi Printer
Barasat

Printed by :
Bharati Offset & Graphics
Kolkata-67

ISBN 81-7864-199-5

P R I N T E D   I N   K O L K A T A

হাস্যরসে কবিকঙ্কণ	অনির্বাণ সাহা	১০৩
The Other Rasa : Nonsense and the Rasa Aesthetics	*Parantap Chakraborty*	১০৭
কাজী নজরুল ইসলামের নাটকে হাস্যরস	শেখ কামাল উদ্দীন	১১০
যুদ্ধবিরোধী নাটকে হাস্যরসের ব্যবহার : আরিস্তোফানেস এবং বাদল সরকারের নাট্য প্রচেষ্টা	সোমজিৎ হালদার	১১৩
বাংলা লোকসাহিত্যে হাস্যরস	কুশল চট্টোর্জী	১১৮
Dissolving Boundaries : That Lonesome Man in Celluloid	*Aritra Choudhuri*	১২৩
হুতোম প্যাঁচার নকশা : হাস্যকৌতুক ও বাস্তবতার অনবদ্য মেলবন্ধন	নিবেদিতা পাল	১২৬
বিদূষক গোপাল ভাঁড় : বাঙালির হাস্যমুখ	উৎপলকুমার মণ্ডল	১২৯
বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় অন্যতম দুই ব্যক্তিত্ব : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু	অপূর্ব নন্দী	১৩৪
Narrating the Comic in Herge's the Adventure of Tintin	*Sohini Ghosh*	১৪০
পাগলা দাশু : সুকুমার রায়ের অনন্য কীর্তি	মানস সাহা	১৪৩
কৌতুক নাট্যরচনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর অনন্যতা	সারদা মাহাতো	১৪৮
হাসির দিঘির রামধনু	সুস্মিতা শেঠ	১৫৩
কুমারসম্ভবের ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী : একটি সরস উপস্থাপনা	মধুবন্তী রায়চৌধুরী	১৫৬
বঙ্কিমের প্রবন্ধে হাস্যরসের অনুসন্ধান	অন্তরা গোস্বামী	১৫৯
Dynamics of Hasya Rasa and / or Comedy in Graphic Novels : A Critical Study of Corridor	*Sumanta Gangopadhyay*	১৬৪

বাংলা লোকসাহিত্যে হাস্যরস

কুশল চ্যাটার্জী*

বিষয়বস্তু : বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা (যেমন—ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, কথা ইত্যাদি)-তে লুকিয়ে আছে নানা হাস্যকর প্রসঙ্গ। সেই বিষয়ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

নবরসের মধ্যে অন্যতম হল হাস্যরস। 'হাস' নামক স্থায়ী ভাবটি বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সাথে মিলিত হয়ে হাস্যরসে রূপ নেয়। বাংলা শিষ্ট সাহিত্যে হাস্যরসের চর্চা বলা যেতে পারে চর্যাপদ থেকে। চর্যাপদের বেশ কয়েকটি চরণ হাস্যময়, তা সেগুলির যতই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাক না কেন। যেমন—"রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খায়।" প্রচলিত বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়—গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়। আবার সদুক্তির প্রসঙ্গ-ও হাস্যকর—

> "শশুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
> কানেট চোরে নিল, কাগে মাগঅ॥"

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও হাস্যরসের ধারা অব্যাহত ছিল। তা সে চরিত্রের কারণেই হোক ; যেমন—ভাঁড়দত্ত

> "মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
> এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥" [কালকেতুর ভোজন]

বা ঘটনার বর্ণনায় হোক ; যেমন—'অন্নদামঙ্গলকাব্য'-এ বিবাহ বাসরে—

> "বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হইলা হর।
> এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
> মেনকা দেখিল চেয়ে জামাই ন্যাংটা।
> নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥"

আবার রামায়ণে ইন্দ্রজিৎকে বলা অঙ্গদের শ্লেষ তীব্রবাক্যও যথেষ্ট হাস্যকর—

> "অঙ্গদ বলে সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিতা।
> এই যত বসিয়াছে সবই কি তোর পিতা॥
> ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্যরে তোর মাকে।
> এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে॥"

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এল হাস্যরস। আর তাই আমরা পেলাম নতুনদা'র মতো চরিত্র ('শ্রীকান্ত'-১ম পর্ব : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)-কে, 'বরযাত্রী' (বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)-র মতো রচনা বা 'বিরিঞ্চিবাবা'-র রচয়িতা (পরশুরাম/রাজশেখর বসু)-কে।

* অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভনিং কলেজ

বাংলা লোকসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, সেখানেও হাস্যরসের উপাদান কিছু কম নেই। হাসি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে যে রচয়িতারা মনস্থ ছিলেন তা মনে হয় না। নিজেদের মনের ভাব, প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা যেভাবে, যে অনুষঙ্গ আশ্রয় করে, তা ব্যক্ত করেছিলেন সেটি যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ।

প্রবাদ প্রবচন

...মূলত অভিজ্ঞতা নির্ভর রচনা। অথচ প্রবাদের হাসির উপাদান যথেষ্ট আছে।

...শব্দচয়ন ও ভাষা-প্রয়োগগত : অন্ধকার সেরঘুট্টি।

চোরের মায়ের কুরঘুট্টি॥

[...ঘুট্টি' = নিবিড় মেঘ। 'কুরঘুট্টি' = আনন্দ]

...চরিত্রগত : বামুনে দক্ষিণা ধরে

ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে

...স্বভাবগত : যার কাটে তার কাটে, খোপার তাতে কি

...সমাজগত : মাতাল, গাঁজাল পিড়ে, বিশ্বাস নেই এই তিনে

...সমালোচনা অর্থে : কাঁথ খান কাঁথ খান বউ ঠাকুর কি পাতাল মাছ খান।

খান খান খান, একটুখানি তেল পেলে নাইতে চলে যান॥*

...কিছু হাস্যকর প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখ করা যাক—

...কই না দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

...রূপ কেশো তপস্বিনী।

...গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

...গেল পায়ে আলতা, খাঁদা নাকে নথ।

...ঘরে পেটে ভাত নাই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।

...বউ ঘরে বউনা গরল ডাকিনী।

...দিন হলে মানুষের-ঝা, রাত হলে বাঘিনী॥

...শাশুড়ী মল সকালে।

...খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব গিয়ে বিকালে॥"

...হ কাউনী আপনাউনী, ননদ মাগীপর।

...শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর॥

—ইত্যাদি

...ছড়া

প্রবাদের পাশাপাশি লোকছড়াও এমন কিছু আছে যা যথেষ্ট হাস্যকর। যেমন—এক লোভী স্ত্রী স্বামীকে ...দিয়ে মাছ খেয়েছে। তার্কিক ও হিসাবী স্বভাবের স্বামী মাছের হিসাব চাইলে বধূ যেভাবে তার নিখুঁত ...দিয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি হাস্যকর—

"ষোলো কৈ ষোলুয়ে দুটো গেল আর পালিয়ে

অন্তুও যে থাকে চোদ্দ দুটো নিয়েছে বেড়াল বৈদ্য

হারিয়ে গেল দুটো আরও
তবুও তো থাকে বারো
দুটো দিয়ে কিনেছি রস
তবুও তো থাকে দশ
দুটো দিয়ে কিনেছি কাঠ
তবুও তো থাকে আট
ঘরে আছে মেনি বিড়াল/তার জন্য দুটো যায়
তবুও তো থাকে ছয়
জলে গেল দুটো তার
তবুও তো থাকে চার
ঘরে আছে রোগা ছেলে/তার জন্য একটা থুই
তবুও তো থাকে দুই
চক্ষু খেয়ে পাতের দিক চেয়ে দেখ"
তবুও তো থাকে এক

শেষপর ঐ গৃহিণী রেগে বলেছে—

"আমি যদি ভালো মানুষের ঝি তাই একমাছকে হিসাব দি
তুই যদি হোস ভালো মানুষের পো   তবে কাঁটা খানি খেয়ে মাছ খানি/আমার জন্য থো।"

• ছেলে বিধর্মী মেয়েকে বিয়ে করায় মায়ের বিড়ম্বনার চিত্র আর একটি ছড়ায় পাই—

"মিনিসে মিনি, কইবো কারে হায়
খোকার বৌ সাঁঝ দেখাতে
চেরাগ বাতি চায়"

• ধর্মীয় বিদ্বেষ জনিত ছড়াও পাওয়া যায়, যেগুলির প্রকাশভঙ্গী হাস্যোদ্দীপক। যেমন—

হিন্দুর উক্তি :

"আল্লা আল্লা বলতে ভাই, আল্লা নাইকো ঘরে।
সোনার টুপি মাথায় দিয়ে বেগুন চুরি করে।।"

মুসলমানের উক্তি :

"হরি বড় দয়াময়
কথায় বটে কাজে নয়"

• ননদ-বৌদির সম্পর্ক অম্লমধুর। তারই পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ছড়ায়, যেখানে ননদের প্রতি চরম অবহেলা বা পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নদী অধ্যুষিত অঞ্চলে ননদকে কুমিরে নিয়ে গেলে বৌ তা কাউকে ইচ্ছে করে সময়মতো জানায়নি। পরে তার উক্তি—

"ভালো কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।।"

• ধাঁধা—

ধাঁধা মূলত বুদ্ধিপ্রধান হয়। তবু কখনও কখনও বিষয় নির্বাচনে বা শব্দ-প্রয়োগের জন্য ধাঁধাও হয়ে ওঠে হাস্যকর। যেমন—

ক. একটা বুড়ির তিনটি মাথা   উত্তর : উনুন
খ. একটুখানি মামা, গা ভর্তি জামা   উত্তর : পিঁয়াজ
গ. গাছটি ঝাপুর ঝুপুর
তার তলায় চৈতন্য ঠাকুর   উত্তর : বেগুন

৫। এ ঘর যাই ও ঘর যাই
দুম্‌দুমিয়ে আছাড় খাই   উত্তর : ঝাঁটা

—ইত্যাদি

• লোকসঙ্গীত—

বাংলার লোকসঙ্গীতেও হাসির বহু খোরাক পাওয়া যায়। কারণ, লোকসঙ্গীতে বার বার উঠে এসেছে সমাজ, সাময়িক ঘটনা, মানুষের আচরণ। আর কখনও এগুলিকে নিয়ে ব্যঙ্গও করা হয়েছে লোকসঙ্গীতে। জন-দুঃখের কারণে রেল-ভাড়া বৃদ্ধিকে 'হুজুগ' আখ্যা দিয়ে একটি ভাদুগানে বলা হয়েছে—

"সাবাস হুজুগ এল।
লড়াই হয়ে রেল মাশুল বেড়ে গেল।
কাশী যেত পাঁচ টাকাতে লোকে
এখন সাতটাকা পড়তা হল।
পূর্বে আট টাকায় বৃন্দাবন যেত
(এবে) বার টাকা দর হল।"

অন্য একটি ভাটিয়ালী গানে দেখা যায়—হাস্যকর ভাবনার প্রকাশ—

"মোরে পাগল করিলি রে মনের মশারে।
দয়া করে আমীর ঘরে কখনো গিয়ে বসারে ॥"

• যুক্তফ্রন্ট পার্টির কথা একটি ভাদুগানে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তাও যথেষ্ট হাসির উদ্রেক করে—

"চৌদ্দ জনে ভাদু পূজায় হে গড়েছিলাম যুক্তফ্রন্ট পার্টি।
আজকে ফ্রন্ট ভেঙে গেল, হল ভীষণ ঝগড়া ঝাটি ॥
এক পার্টিতে আটজন হল হে, ছ'জন জোটে এক পার্টি।
এই আট পার্টি আর ছ'পার্টিতে ভীষণ কথা কাটাকাটি ॥"

• লোকনাট্য—

বাংলার লোকনাট্যে বার বার উঠে এসেছে সমকাল। আমাদের দেখা ভালো-মন্দ মানুষগুলি নিজেদের স্বভাব নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে লোকনাট্যের পটে। তাদের আচার-আচরণ, স্বভাব যখন নাটকে ফুটে ওঠে, তখন কখনও কখনও তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। যেমন—আলকাপ লোকনাট্যে দেখা যায়, এক দরিদ্র গৃহবধূ তাদের অসুস্থ ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য টাকা ধার চাইতে মহাজনের কাছে গেলে—উভয়ের কথোপকথন হাস্যকর হয়ে ওঠে—

মহাজনের উক্তি :
"বল বল ও সুন্দরী
কত নিবে টাকা নাও নাও
আমার তো এই হল কারবার
আমি থাকতে অভাব কি তোমার"
(কু-ইঙ্গিত)

গৃহবধূর প্রত্যুক্তি :
"তোর মুখে মারি ঝাঁটা
তোর ধন দৌলত সব উড়ুক
আগুন লেগে তোর গোলা পুড়ুক ॥"

■ ব্রত—

বাংলার ব্রতগুলি বাঙালীর কামনা-বাসনার স্মারক। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বৌ-মেয়েরা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য নানা ধরনের ব্রত করে আসছেন। নিজেদের কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে বাংলার ব্রতগুলির ছড়া (বা মন্ত্র)-গুলির যে রূপ দেওয়া হয়—তা কখনও হাস্যকর হয়ে ওঠে। যেমন—

"পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে পাকা চুলে সিঁদুর প'রে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।।"

[অশ্বত্থ পাতা ব্রতের ছড়া]

■ কথা—

বাংলা লোককথার ভাণ্ডারটি বেশ সমৃদ্ধ। এতে পাই পশুকথা, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি। কিছু কিছু কথার মধ্যে পাওয়া যায় হাস্যরসের ছোঁয়াও। যেমন—বোকা সিংহের গল্পে দেখা যায় যে, এক খরগোশের কারসাজিতে বনের মধ্যে থাকা কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে লড়াই করার জন্য এক সিংহ কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আবার অপর এক গল্পে দেখা যায় এক অকৃতজ্ঞ বাঘ এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসে তাকেই খেতে গেলে এক শেয়াল বুদ্ধিবলে তাকে পুনর্বার খাঁচায় বন্দি ক'রে ব্রাহ্মণকে যেমন বাঁচিয়েছে তেমনি বাঘকে তার অকৃতজ্ঞতার জন্য শাস্তিও দিয়েছে। এমনই হাস্যকর লোককথার অন্ত নেই।

• বাঙালীর রসিক মনের প্রামাণ্য দলিল এই সব লোক-সাহিত্যের নিদর্শনগুলি। বুদ্ধিমত্তা, আধ্যাত্মিকতা, গূঢ়ার্থ ইত্যাদির পাশাপাশি হাস্যকরতাও বাংলার লোকসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য নিদর্শনগুলি ছাড়াও আরও হাস্যরসাত্মক নিদর্শন রয়ে গেল, কারণ, লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অফুরান।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০।

২. 'গীতিকা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩।

৩. 'বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ', সৌগত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জুন, ২০১০।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অর্থানুকূল্যে
দ্বি-দিবসীয় জাতীয় আলোচনা সভা

বিষয়

জন্মশতবর্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ

২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আয়োজক

বাংলা বিভাগ

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজ

কলকাতা-২০

সহযোগিতায়

মানভূম মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সংকলিত গবেষণাপত্রসমূহ

বিষয় : জন্মশতবর্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ

PROCEEDINGS : Janmasatabarshe Adwaita Mallabarman (A National Seminar)

সম্পাদনা

মণিদীপা শিকদার

ISBN : 978-81-929244-9-6

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলা বিভাগ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজ, কলকাতা-২০

প্রকাশক

শ্রী তপনকুমার ঘোষ

সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ণসংস্থাপন

প্রিন্ট অ্যান্ড প্রেস

কল্যাণী, নদীয়া

প্রচ্ছদ

শ্রী রানা সরকার

মূল্য

[redacted] টাকা FREE COPY

- [illegible]
  [illegible]
- তিতাস একটি নদীর নাম : [illegible]
  [illegible]
- [illegible] : অদ্বৈত মল্লবর্মণ
  [illegible], কলকাতা
- [illegible]
  [illegible]
- তিতাস [illegible]
  [illegible], কলকাতা [illegible]
- [illegible] অদ্বৈত মল্লবর্মণ
  [illegible]
- অদ্বৈত মল্লবর্মণের [illegible]
  [illegible], বাংলা বিভাগ, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন কথা
  [illegible], অধ্যাপক, [illegible] বি. এড কলেজ
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম : সমাজ এবং সংস্কৃতি
  সুকান্ত কুণ্ডু, সহ-অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইন্দিরা গান্ধী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নওদা, মুর্শিদাবাদ
- [illegible] : অদ্বৈত মল্লবর্মণ
  [illegible], সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, [illegible] বি এড কলেজ
- তিতাস একটি নদীর নাম : [illegible]
  মো. মাহবুবুর রহমান, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রসঙ্গ : অদ্বৈত মল্লবর্মণ
  [illegible], অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, [illegible] কলেজ, [illegible], উত্তর ২৪ পরগনা
- অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' : [illegible]
  [illegible], গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতিথি অধ্যাপিকা, [illegible] মহাবিদ্যালয়, [illegible]
- তিতাস একটি নদীর নাম : [illegible]
  [illegible]
- জীবন [illegible] : প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ
  [illegible] মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, [illegible] কলেজ
- অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'রাঙামাটি' : [illegible]
  [illegible] মণ্ডল, অতিথি অধ্যাপক, [illegible] কলেজ
- ছোটগল্পের অদ্বৈত মল্লবর্মণ
  [illegible] সাহা, গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর ছোট গল্প [illegible]
  শিখা হালদার ও অনিরুদ্ধ নায়ক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, বর্ধমান
- অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাসাহিত্যে [illegible] সমাজ এবং জীবনের [illegible] চিত্র
  সুশান্ত মণ্ডল, [illegible] কলেজ, কলকাতা
- স্থান-কাল-পাত্রের সীমানায় 'শাদা হাওয়া'
  অনসূয়া গোস্বামী, প্রাক্তন ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের স্বতন্ত্র ধারা : তিতাস একটি নদীর নাম
  [illegible] পাল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
- **अद्वैत मल्लबर्मन का व्यक्तित्व और 'तितास एक नदी का नाम' का अध्ययन** 203
  श्वेता रस्तोगी, अतिथि प्रवक्ता (आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज), शोध छात्रा (कलकत्ता विश्वविद्यालय)
- **ادوید ملا برمن : تیتاش کی روشنی میں** 211
  Nahid Khanam, Guest Lecturer, A. J. C. Bose College, Kolkata

[illegible]
ISBN : 978-81-929244-9-6

প্রসঙ্গ : অদ্বৈত মল্লবর্মণ

কুশল চৌধুরী, অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভনিং কলেজ, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

সম্প্রবেশ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ১লা জানুয়ারী ১৯১৪ সালে তৎকালীন কুমিল্লার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার গোকর্ণঘাট গ্রামে অদ্বৈতর জন্ম হয় এক ধীবর পরিবারে। শৈশবে অদ্বৈত পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়েন। তাই বলাই যায়, অশৈশব তিনি ছিলেন পিতৃ-মাতৃস্নেহ বঞ্চিত।

এতৎসত্ত্বেও পড়াশোনা থেমে থাকেনি তার। ১৯৩৩ সালে অন্নদা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন তিনি। এরপর কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে কিছুদিন আই এ ক্লাসে পড়াশোনা করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে তাঁকে পড়াশোনাকে ছেদ দিতে হয়।

১৯৩৪ সালে কলকাতায় আগমনের পর মাসিক 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে তিনি কর্মজীবনের যোজন ঘটান অদ্বৈত। এরপর ধীরে ধীরে 'নবশক্তি' পত্রিকা, 'মাসিক মহম্মদী' পত্রিকা, 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা এই পত্রিকাগুলির সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে ফেলেন। এছাড়াও 'নবযুগ', 'কৃষক' ইত্যাদি পত্রিকাও ছিলো তাঁর স্পর্শ-ধন্য। কিছুটা আর্থিক সুরাহার জন্য তিনি বিশ্বভারতীর প্রকাশনা শাখায় কাজও করেন।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি যতটা সফল ছিলেন, ততটাই সফল ছিলেন সাহিত্যিক হিসাবে। তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে তিনি সফলভাবে সাহিত্য-চর্চা করে গেছেন। তার নিদর্শনগুলি হল—

'তিতাস একটি নদীর নাম' (উপন্যাস)

'এক পয়সার একটি' (গ্রন্থ)

'সাদা হাওয়া' (উপন্যাস)

'নামহীন কাহিনী'

'সাগর তীর্থে'

'দল বেঁধে' (গল্পগ্রন্থ)

'রাঙামাটি'

'জীবনতৃষা' (অনুবাদ : লাস্ট ফর লাইফ)

তাঁর সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'তিতাস একটি নদীর নাম'। মালো বা মৎস্যজীবীদের কথা উপন্যাসে আছে। পরে এটি নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেন ঋত্বিক ঘটক ১৯৭৩ সালে।

অকৃতদার অদ্বৈত নিজের সীমিত ক্ষমতা দ্বারা চেষ্টা করেছেন জনসাধারণের উপকার করার। নিজের স্বল্প আয় থেকে যেমন তিনি অপরকে আর্থিক সাহায্য করতেন, তেমনই কলকাতার মালোপাড়ার শিশু-কিশোরদের জন্য ঘরোয়া বিদ্যালয়ে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবন ঘোষের মতো অদ্বৈতও ছিলেন স্বল্পজীবী। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন তিনি। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে (১৬ এপ্রিল, ১৯৫১) কলকাতার নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলায় নিজেরই বাড়িতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজের নশ্বর দেহ ত্যাগ করে পরলোকে যাত্রা করেন। রেখে যান তাঁর

ISBN : 978-81-929244-9-6

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি।

স্মৃতি-জীবনে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২০১২ সালের ১লা জানুয়ারী রবিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণঘাটে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে আবক্ষ মূর্তি যেমন নির্মিত হয়েছে, তেমনই তাঁর সুহৃদবর্গ তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন গ্রন্থ তুলে দেন রামমোহন লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর স্বল্পকালীন জীবনের মধ্যে অমরতা পেয়েছেন তাঁরই কীর্তির মধ্যে। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও জনহিতকর কার্যাবলী তাঁকে চিরকাল অমর রাখবে জনমানসে।

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদ-প্রতীম সাহিত্যিক হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের (বর্তমান বাংলাদেশ) মহকুমার গোকর্ণ বা গোকর্ণঘাট গ্রামে এক দরিদ্র মালো পরিবারে অদ্বৈতের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ, মায়ের নাম উদ্ধার করা যায়নি। ছেলেবেলা ছিলেন তিন ভাই, এক বোন। ভাইদের মধ্যে লেখক ছিলেন দ্বিতীয়। শৈশবেই তাঁর মা, বাবা ও দুই সহোদরের মৃত্যু হয়।

আর পাঁচজন সাধারণ শিশুর মত তাঁর শৈশব মধুর ছিল না। পিতৃ-মাতৃহারা অদ্বৈতের লেখাপড়ার সূচনা হয় মালোদের চাঁদার টাকায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাইনর স্কুলের তিনি ছিলেন ভালো ছাত্র। এই স্কুলেই সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন তিনি। এরপর তিনি অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩৩ সালে এখান থেকেই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে আই এ পড়তে যান কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে।

কিশোর বয়স থেকেই অদ্বৈত লেখালিখি করতেন। 'মাস-পয়লা', 'খোকাখুকু', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি নামী পত্রিকা ও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। ১৯৩৪ সালের ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অদ্বৈতের পড়াশোনা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ল, কারণ অর্থের অভাব। তাই এক রকম বাধ্য হয়ে জীবিকার তাড়নায় তাঁকে চলে আসতে হল কলকাতায়। তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় সংবাদপত্র প্রকাশনা-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাসিক 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু তাঁর। এরপর ১৯৩৬ সালে ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত পরিচালিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় যোগ দেন তিনি। সম্পাদক-কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন তিনি। এ পদে তিনি ছিলেন একাদিক্রমে তিন বছর। এ সময়ই তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। 'নবযুগ', 'কৃষক' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রে চাকরী করার পাশাপাশি তিনি বিশ্বভারতীর প্রকাশনা শাখাতেও কিছুদিন কাজ করেন। কাজ করেন 'দেশ' পত্রিকাতেও।

১৯৫০ সালে 'দেশ' পত্রিকায় চাকরি করা কালীন অদ্বৈতের যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ে। রোগ ধরা পড়ার পর [illegible] কর্তৃপক্ষ তাঁকে কাঁচরাপাড়ার যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। ১৯৫১ সালের ১৬ই এপ্রিল বেলেঘাটার ষষ্ঠীতলার বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অদ্বৈত ছিলেন স্বল্পভাষী, চুপচাপ। ছিলেন বই-পাগল। ছিলেন দরদী। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও অসহায় মালোপাড়ার শিশু-কিশোরদের অবৈতনিক শিক্ষায় পরিচালনা নিয়োজিত প্রয়াসকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁর সমস্ত বই রামমোহন লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন।

ISBN : 978-81-929244-9-4

১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১লা জানুয়ারি, ২০১১ খ্রি: কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণঘাটে তাঁর পৈতৃক ভিটেয় আবক্ষমূর্তি নির্মিত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও জেলা পরিষদের অর্থায়নে।

॥ ২ ॥

অদ্বৈত তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন। এগুলি হল :

তিতাস একটি নদীর নাম (উপন্যাস), দলবেঁধে (গল্প সংকলন), শাদা হাওয়া (উপন্যাস), এক পয়সার একটি (গল্প), রাঙামাটি, সাগরতীর্থে, জীবনতৃষ্ণা (অনুবাদ : লাস্ট ফর লাইফ)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবিকা নির্ভর উপন্যাসের ধারায় অদ্বৈতের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি একটি উজ্জ্বল কীর্তি, মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' সমরেশের 'গঙ্গা'র সাথে এক পংক্তিতে স্থান দেওয়া যায়। এই উপন্যাসে লেখক কুমিল্লা জেলার তিতাস নামক একটি নদীর ধারে বাস করা জেলে সম্প্রদায়ের জীবনধারা, উৎসব, সংস্কৃতি এক কথায় 'local colour'-কে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির সার্থকতা এখানেই যে, এতে শুধু জেলেদের জীবনই চিত্রিত হয়নি, তাদের প্রতিবেশী কৃষিজীবীদের জীবনও চিত্রিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনাগুণে উপন্যাসে তিতাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—

'তিতাস একটি নদীর নাম'। তার কূলজোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না"[১]।

উপন্যাসটিতে মালো সম্প্রদায়ের কথা আছে, আছে তাদের জীবন-যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কথাও। এতে মালো সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আধুনিক সভ্যতার করাল গ্রাসে এর অবলুপ্তির চিত্র আছে। প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব, সুরের উন্নত রুচি ও অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল বিশুদ্ধ আবেগের যে সমন্বিত রূপ দেখা যায় তা নিম্নবর্গ ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবনীয়[২]।

লেখক উপন্যাসটিতে মালোদের জীবনের নানা প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন এদের লৌকিক জীবনের নানা দিক—

সারি গান :

"আকাই মাঝিরে নাও, ঝুমুর ঝুমুর করে নাও
কিয়া অইলাম রে নাথরের সন্ধই পাইলাম না"

ছড়া :

"কাউয়ার বনী মরল
কুলা দিয়া ঢাকল
দূর হ কাউয়া দূর"

প্রবাদ :

"যা মারে বাপ অলই, তাই মারেই পত্ত"

উপন্যাসটিতে আছে তাদের বিভিন্ন উৎসবের কথাও, যেমন—মনসা পূজা।

উপন্যাসটির মূল্যায়নে বলা যায়,

ক। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবন এর কেন্দ্রে আছে।

খ। এদের সাথে নদীর সম্পর্কের দিকটি এখানে নিবিড় ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অনলাইন/ ...
ISBN : 978-81-939244-9-...

গ। ব্যক্তি জীবনের থেকে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে সমষ্টি-জীবন।

এই উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার বলেছেন,

“তিতাস জীবনের শেকড় প্রাকৃত জীবনের গভীরে প্রোথিত। এই প্রাকৃত জীবনকে বাইরে থেকে গভীর ... লেখক এর ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, তা বহু ভঙ্গিমাও বৈচিত্র্যের অধিকারী।”[১]

... হয় এই উপন্যাসটি মাসিক পত্রিকা ‘মহম্মদী’তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এর মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। পরে অনুরাগীদের একান্ত অনুরোধে তিনি পুনরায় কাহিনীটি লেখেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এই শিরোনামে লেখাটি বের হয়। এই নামেই ঋত্বিক কুমার ঘটক ১৯৭৩ সালে একটি চলচ্চিত্র গ্রহণ করেন। এটাই সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন ছিল —

“তিতাস পূর্ববাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ... এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়।”

তথ্যসূত্র :

১। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ভূমিকা অংশ।

২। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’।

৩। শান্তনু কায়সার।

গ্রন্থঋণ :

ক। শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য।

খ। চতুর্থ দুনিয়া : অদ্বৈত মল্লবর্মণ (বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪)

ANNYOBRATI

Editors
Dr. Chaitali Mukherjee
Dr. Mahuya Bhaumik
Prof. Anirban Basu Roy Choudhuri

Annyobrati

Edited by Dr. Chaitali Mukherjee, Dr. Mahuya Bhaumik and
Prof. Anirban Basu Roy Chowdhury

© Media Center, Derozio Memorial College

Cover Design: Debasish Saha

Typeset: Prasannajit Mishra

First Published 2015

Published by Rupali
Surjendu Bhattacharya
Subashpally, Khalisani, Chandannagar, 712138
City Office, 33/1, N.S. Road, Marshall House, 5th Floor, Kolkata-1
Sales Counter: 206, Bidhan Sarani, Kolkata-6
Mobile: +91 9432062928/8479912362

Printed at Rabindra Press,
11A, Jagadish Nath Roy Lane, Kolkata-6

ISBN: 978-93-81669-40-2

Price: ₹150

CONTENTS

The Medicinal Use of Jasmine, Lotus and Palash
Sunanda Haldar 1

Insect Diversity Study during Field Trip at Baranti, Purulia
R. Banik and S. Sarkar 4

Obstacles of Higher Education for Women Scheduled Tribes Students of Villages of Bagdah in North 24 Parganas District
Dina Das and Kishor Kumar Roy 9

Partition Fiction: Genocidal Rigmarole and the Carnage of Communal Ferity Disguised as Freedom
Souvik Mondal 22

Effects of Gravity on Human Physique
Kalyan Brata Chatterjee 28

W.B. Yeats, the Ever Changing Poet
Mr. Joydeep Sen 32

Junk Food and its Negative Effect
Mrinal Sarkar 35

Modernism and Post Modernism
Nachiketa Deb 40

Revision of Aquatic Plants for Ecosystem Sustainability and Betterment of Mankind
Dr. Goutam Mukherjee 42

ফুটবলে ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্ব : একুশ শতকের প্রেক্ষিতে
ধ্রুব কর 56

'পথের পাঁচালী' কার? বিভূতিভূষণ না সত্যজিৎ?
কৃষ্ণা দেব পাল 71

শিক্ষক ও সমাজ
সুবর্ণা ঘোষ সামন্ত 74

শিশু, শৈশব ও রবীন্দ্রনাথ
কুশল চ্যাটার্জী 78

শিশু, শৈশব ও রবীন্দ্রনাথ

কুশল চ্যাটার্জী

অতিথি অধ্যাপক, কবি নজরুল ট্রেনিং কলেজ

বিষয়বস্তু : রবীন্দ্রনাথ শিশু ও তার শৈশবকে তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে ধরেছেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থটি। এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ কীভাবে শিশু-মনের অন্তর্লোকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করা হল এই কাব্যের কয়েকটি কবিতা অবলম্বনে।

সূচি শব্দ : শৈশব, শিশুমন, পারিবারিক চিত্র, পৌরাণিক প্রসঙ্গ, ফ্যান্টাসি, মাতৃমন।

সালটা ১৯০২। রবীন্দ্র-জীবনের নিরিখে এক স্মরণীয় বছর। এই বছরে রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে চির বিদায় নেন তাঁর 'ছুটি' সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী। ১৮৮২ সালে যাঁর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে একদা রবীন্দ্রনাথ পথচলা শুরু করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর গৃহিণী, বান্ধবী আবার পরামর্শদাত্রীও। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত স্ত্রী-র দুই হাতে সেবা করেছেন কবি নিজে। আর তখন রোগাচ্ছন্না কবি-পত্নী বলেছিলেন—
"আমাকে বলছ, ঘুমোও ঘুমোও। শমীকে রেখে এলে শান্তিনিকেতনে। আমি ঘুমোতে পারি তাকে ছেড়ে।"[১]

উনিশ বছরের দাম্পত্যের অবসান ঘটিয়ে চলে গেলেন কবিপত্নী। কবির বেদনা-গ্রন্থে আর একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। তাঁকে ছেড়ে ইতিমধ্যেই চলে গেছেন কন্যা রাণী। কবি নিবিড়ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন বোলপুরের আশ্রমের কাজে। স্ত্রীর মৃত্যুতে 'স্মরণ' (১৯০২-০৩) এ মানসিক শান্তি খুঁজে নিতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু মাতৃহারা সন্তানেরা? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজাত ক্ষমতারই আশ্রয় নিলেন। কলম ধরলেন তাঁদের জন্যে, লিখে ফেললেন গোটা একটা কাব্য। নাম দিলেন 'শিশু' (১৯০৩)। কাব্যটির কবিতাগুলির মধ্যে নিজেদের খুঁজে পেয়ে যদি তাঁরা খুশি হন। হয়েওছিলেন। শোনা যায়, 'বীরপুরুষ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের

কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের খুব পছন্দও ছিল। পুত্রের বিদেহী আত্মাকে প্ল্যানচেটে ডেকে যখন কবি তাঁকে প্রশ্ন করেন, "তোর জ্বর হলে আমি কবিতা পড়তুম, মনে আছে?" তখন শমী বলেছেন— "সব মনে আছে।" ঐ পাল্টা প্রশ্নে শমী 'বীরপুরুষ' কবিতার একটি পংক্তি আবৃত্তি করে দেন। আসলে, 'এই শিশু' কাব্য শিশুমনের কাব্য কবিতা হিসেবে অতি বিস্ময়কর। কেউ কেউ শিশুজীবনের রূপকে ('ঝুলাই' ও 'পিটার প্যান') অনেক তত্ত্বকথা বলেছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো শিশু মনের অন্তঃপুরে আর বড়ো কেউ প্রবেশ করতে পারেননি।"

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, '...নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে।'" ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু 'বড়োদের মন'-এর বিশ্লেষণ করার অধিকার তিনি রক্ষা করলেন 'শিশু-মন'-এর ক্ষেত্রেও। নিজের মনের ও পর্যবেক্ষণের আতস কাচের নীচে রবীন্দ্রনাথ টেনে আনলেন শিশু মনকে, হয়ে উঠলেন শিশু-মন-বিজ্ঞানী। শিশু-কেন্দ্রিক মাতৃমনও বাদ গেল না। তার নির্যাসে সৃষ্টি করলেন 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ।

শিশু মন বিচিত্র। শিশু মন খেয়ালী। আর সেই খেয়ালী মনে সৃজন হয় নানা সময়ে নানা প্রশ্ন। শিশু মাকে জিজ্ঞাসা করেই বসে,

"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।" ('জন্মকথা')

মাও এর উত্তর দেন, "ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।" (ঐ)

একদিন মা জল নিতে ও পাড়ার দীঘিতে গেছেন। সময় মাঝদুপুর। এমন সময় 'ঘুমচোর' ঘরে চুপি চুপি ঢুকে খোকার ঘুম চুরি করে নিয়ে গেল। আর তাই—

"মা এসে অবাক রয় দেখে খোকা ঘর ময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে" ('ঘুমচোরা')

সোনা খোকা মায়ের দুলাল। মা তার কোনো দোষই দেখেন না, দেখতেও চান্না। পাছে কেউ খোকার দোষ খুঁজে ফেলে, মা খোকার পক্ষ নেন, বলেন

"বাছা রে, তোর সবাই ধরে দোষ।
আমি দেখি সকল-তাতে
এদের অসন্তোষ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
ছি ছি, কেমন ধারা।

ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে,

সে কি লক্ষ্মীছাড়া।" ('অপযশ')

আবার অন্যত্র মা এও বলেন,

"খোকা আমার কতখানি

সে কি তোমরা বোঝ

তোমরা শুধু দোষগুণ তার খোঁজ।" ('বিচার')

খোকাকে নিয়ে মায়ের স্বপ্নের শেষ নেই। প্রতিটি মা-ই তাঁর সন্তানের মধ্যে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব খুঁজে পান। কেনো কোনো মা তো বলেই ফেলেন—

"খোকার ছিল রতনমণি কত

তবু সে এলো কোলের 'পরে

ভিক্ষারিটির মতো।

এমন দশা সাধে?

দীনের মতো করিয়া ভান

কাঁড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,

তাই সে এলো বসন হীন

সন্ন্যাসীর ছাঁদে।" ('চাতুরী')

খোকা এখন বড়ো হয়েছে। এখন সে কথা বলতে পারে। তাই পড়ার থেকে ছুটি পেতে মায়ের কাছে আব্দার করে বলেছে—

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল,

সকাল থেকে পড়ছি যে মেলা।

এখন আমি তোমার ঘরে ব'সে

করব শুধু পড়া পড়া খেলা।" ('প্রশ্ন')

কখনও কখনও কঠিন প্রশ্ন করে খোকা মাকে আঁতান্তরেও ফেলে দেয়—

"যদি খোকা না হয়ে

আমি হতেম কুকুর-ছানা

তবে পাছে তোমার পাতে

আমি মুখ দিতে চাই ভাতে

তুমি করতে আমায় মানা?

সত্যি করে বল্

আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর।
কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
যা মা তবে যা মা..." ('সমব্যথী')

অনুকরণপ্রিয়তা শৈশবের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যের 'মাস্টারবাবু' কবিতায় খোকাকে মাস্টার সেজে বাড়ির বেড়াল-ছানাটির ওপর মাস্টারি করতে দেখা যায়—

"আমি ওরে বলি বার বার
'পড়ার সময় তুমি পোড়ো—
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।'

... ...

আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ।'"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শৈশবে রবীন্দ্রনাথের নিজে শিক্ষক সাজার কথা—

"ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবল মাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। ...রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া, চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম।"*

খোকা এখন 'বড়ো' হয়ে গেছে। তাই বোনের বালখিল্যতায় ওর অবাক লাগে। বিরক্তও হয় সে। তাই মায়ের কাছে নালিশ করে সে—

"খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলে মানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেন ফানুস।" ('বিজ্ঞ')

এ তো গেল ছোট্টো বোনের কথা। কিন্তু বড়ো হলে খোকা দাদা, বাবা, মামাকে কি বলবে?

দাদাকে বলবে "তুমি চুপটি করে পড়ো।" ('ছোটোবড়ো')

মামাকে বলবে— "দেখছ না কি মামা,

হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।" (ঐ)

বাবাকে বলবে— "'আমি এখন তোমার মতো বড়ো'" (ঐ)

খোকা ছোটো, তাই বাবার সাহিত্য-চর্চা তার কাছে "লেখা-লেখা খেলা" ('সমালোচক')। তার কাছে লেখা অপেক্ষা নৌকা করাই কাগজের যথার্থ সদ্গতি। তাই সে মাকে বলে—

"বাবা যখন লেখে

কথা কও না দেখে।

বড়ো বড়ো রুল কাটা কাগজ

নষ্ট বাবা করেন নাকি রোজ।

আমি যদি নৌকো করতে চাই

অমনি বল, 'নষ্ট করতে নাই।'

সাদা কাগজ কালো

করলে বুঝি ভালো?" (ঐ)

শিশুমনে ফ্যান্টাসির অবাধ আনাগোনা। তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থের 'বীরপুরুষ' কবিতায়। যেখানে খোকা একলাই সব ডাকাতদের নিপাত করে মা-র কাছ থেকে 'চুমো' বকশিস পায়। আবার ডাকাত তাড়িয়ে মায়ের কোলেও উঠতে ছাড়ে না ("চু খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে")।

কবি নিজের শৈশবে রাজার বাড়ি খুঁজে গেছেন। ("কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে।"[৮] আবার কবির সৃষ্ট শিশুও রাজার বাড়ির খোঁজ করেছে—

"আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো;

সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।" ('রাজার বাড়ি')

শিশুমনের অনেকটা অধিকার করে থাকে পুরাণ তথা পৌরাণিক কাহিনি। কারণ শিশুরা বড়োদের থেকে এগুলির গল্প শোনে। কবি শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যও এখানে দেখিয়েছেন। লিখেছেন—

"বাবা যদি রামের মতো

পাঠায় আমায় বনে,

যেতে আমি পারি নে কি

তুমি ভাবছ মনে?"

কবিতাটিতে আছে রাম, লক্ষ্মণ প্রমুখ পৌরাণিক চরিত্র ও 'চৌদ্দ বছর'-এর পৌরাণিক প্রসঙ্গের কথাও।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল এক সন্তান-হারা পিতাও। তার সবটুকু অনুভূতিই যেন ধরা পড়েছে এই কাব্যের 'বিদায়' কবিতায়। যেখানে 'বিদেহী' খোকা মাকে বলেছে—

"হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা তোর বুকে বয়ে,
ধরতে আমায় পারবি নে মা হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ,
জানতে আমার পারবে না কেউ
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।"

নিজেও তিনি হয়তো তাঁর বিদেহী সন্তানের উপস্থিতি এভাবেই অনুভব করতেন। তাই তো কবিতাটির শেষে তিনি যা লিখলেন, তা তো তাঁর একান্ত বিশ্বাস-জাত সত্য—

"...খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।"

শিশু কাব্যগ্রন্থের যে কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল, তা থেকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়–

১. শিশুমনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই এগুলিতে পাওয়া যায়।
২. শুধু শিশুমন নয়, এ কাব্যের কিছু কবিতায় উঠে এসেছে মাতৃমনের ছবিও।
৩. শিশু অনেক সময় কথায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কবির সীনেন্দ্র দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়েছে (দ্র. 'সমালোচক' "লেখে/...করেন...")।
৪. পুরাণ প্রসঙ্গ কবিতাগুলির মধ্যে এসেছে।
৫. শুধু শিশু ও তার মাতা নন, পরিবারের অন্যান্য মানুষজন তথা পারিবারিক চিত্রও কবিতাগুলির মধ্যে উঠে এসেছে সঙ্গত কারণে। কারণ শিশুকে তার পরিবার-বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। সেখানেই সে বড়ো হয়, জীবনের প্রাথমিক পাঠ সে সেখান থেকেই সংগ্রহ করে।
৬. সব শেষে এটাও বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলির মধ্যে একটি ক্রম বজায় রেখেছেন। শুরু থেকে শেষের দিকে পাঠক কবিতাগুলি পড়তে পড়তে

এগোতে থাকেন, তার সঙ্গে বাড়তে থাকে শিশুর বয়সও। হামাগুড়ি দেওয়া থেকে সে ক্রমে উঠে দাঁড়ায়, কথা বলে, আবার ছোট্ট বনের শিশু-আচরণে বিস্মিতও হয়।

তথ্যসূত্র :

১। চৌধুরী অমিতাভ, রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা, ২০০১, সৃষ্টি প্রকাশক, কলকাতা, পৃ. ৪১

২। তদেব, পৃ. ৫৯

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার , বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ২০০৬-০৭, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪২২

৪। চোখের বালি', সূচনা অংশ, ১৪১০, শুভম্ সংস্করণ, কলকাতা/ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩৪৭

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবন স্মৃতি/নর্মাল স্কুল, ২০০৯, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ২১

৬। তদেব, 'ঘর ও বাহির', পৃ. ১৬

নতুন ভাবনার আলোকে লোকযান

সম্পাদনা

পীযূষ সরকার • সিদ্ধার্থ খাঁড়া

JUTAH BHARNAR ALOKE LOKEZAN
Edited by Pijush Sarkar & Siddhartha Khanra

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৫

প্রকাশক
কুমকুম ভট্টাচার্য
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
গৌতম নন্দী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্ট আর্ট
ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৪

ISBN 978-93-82663-45-4

২০০ টাকা

বাংলা রূপকথায় নারীর অবস্থান	দেবাংকৃতা সরদার	১৭৭
আধুনিক প্রযুক্তির অভিঘাতে লোক প্রযুক্তি	সঞ্জীবকুমার সরকার	১৮৯
পাণিহাটির দণ্ডমহোৎসব মেলা ও আনুষঙ্গিক কিংবদন্তি বিচার	অরুণাভ মিত্র	২০১
রমেশচন্দ্র সেনের ছোটগল্পে লোকজ উপাদান	মহ. সইফুল ইসলাম	২১৮
উপভাষা ও সমাজভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	সুব্রত দাস	২২৩
সৈকত রক্ষিতের সিঁদুরে কাজলে : নারীর অসহায়তার ভিন্নরূপ	বিশ্বজিৎ মণ্ডল	২২৯
গণদেবতা : লোকায়ত জীবন	মহ. আসফাক আলম	২৩৯
অরণ্যের অধিকার : মুণ্ডাদের লোকায়ত জীবন	কুশল চ্যাটার্জী	২৫১

অরণ্যের অধিকার : মুণ্ডাদের লোকায়ত জীবন

কুশল চ্যাটার্জী

১.

মহাশ্বেতা দেবী দায়বদ্ধ লেখিকা। সমাজের নীচু তলার মানুষের সাথে তাঁর আছে গভীর আত্মীয়তা, আবার ''অরণ্যচারী মানুষগুলির সঙ্গে তাঁর অধিকতর সম্পর্ক''[১] ও আছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মহাশ্বেতা দেবী লিখে গেছেন একাধিক উপন্যাস। তাঁর লেখায় বারে বারে ফিরে এসেছে অরণ্যবাসীদের কথা। এমনই একটি রচনা 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭)।

উপন্যাসটির নামকরণ থেকে স্পষ্ট যে, উপন্যাসটির পিছনে রয়ে গেছে একটি গোষ্ঠী বা জনজাতি। তারা হল মুণ্ডা। বিরসা এদের নেতা হতে পারেন, হতে পারেন উপন্যাসটির নায়ক, তবু তাঁর নেতৃত্বে যে 'উলগুলান' (১৮৯৫-১৯০০) হয়েছিল তা ছিল সমগ্র মুণ্ডা সমাজের। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসটি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন—

> "শোনো বলি, কিভাবে লিখেছি 'অরণ্যের অধিকার'..... 'অরণ্যের অধিকার' লেখার জন্য বীরসা মুণ্ডার চরিত্র আমাকে গভীর প্রভাবিত করেছিল। তার ওপর আদিবাসীদের মূল সমস্যাগুলির বিষয়টি তো ছিলই।.....আদিবাসী এলাকায় গেলাম। অনেক অজানা জানলাম।"[২]

বিরসা মুণ্ড ও মুণ্ডা সমাজ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর এই 'অনেক কিছু জানা'র ফলে 'অরণ্যের অধিকার'-এ চিত্রিত হল মুণ্ডাদের ব্যক্তিগত লোক জীবন। তাদের জীবনের নানা দিক হয়ে গেল উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে।

২.

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটিতে মুণ্ডাদের লোক জীবনের যে যে দিক দেখা গেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হল—

ক। প্রসঙ্গ : জঙ্গল :

মুণ্ডাদের 'উলগুলান'-এর কেন্দ্রে ছিল তাদের অরণ্য বা জঙ্গল। উপন্যাসে আছে—

> "জঙ্গল নতুন করে মুণ্ডা মায়ের মত, বীরসার মায়ের মত, জঙ্গলের সন্তানের কোলে নিয়ে বসে। .....অরণ্য মুণ্ডাদের মা, আর দিকুরা মুণ্ডাদের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে। উলগুলানের আগুন জ্বেলে বীরসা জননীকে শুদ্ধ করতে চেয়েছিল।"

আর তাই 'অরণ্যের অধিকার' হয়ে উঠল ছোটনাগপুর, পালামৌ, সিংভূম, চক্রধরপুর ইত্যাদি এলাকা ও তার সাঁওতাল, ওঁরাও আদিবাসীদের কথা। উপন্যাসটির ছিন্ন অনুষঙ্গটিতেও প্রাধান্য পেয়েছে এই 'জঙ্গল' ও তাদের 'মায়েরা'রা।

খ। প্রসঙ্গ : জনজাতি :

উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে একটা জনজাতি বা গোষ্ঠীর কথা, যাদের জীবনে 'ভাত' ও 'নুন' স্বপ্ন, বাস্তব 'ঘাটো'। এই সব দিকু ও 'দিকু'দের দ্বারা শোষিত মানুষগুলির মনে তাই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে একটাই প্রশ্ন—"মুণ্ডা শুধু ঘাটো খাবে কেন?"[৭]

গ। প্রসঙ্গ : সংগীত :

উপন্যাসটিতে কয়েকটি মুণ্ডারী লোক গানের উল্লেখ আছে। গানগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা, আবেগ, বিশ্বাস। গানগুলি—

১. "হে ওতে দিসুম সিরজাও"

২. "বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হেনকো"

৩. "বোরবেগারী দিতে মোদের বাঁধে ঘরে লৌ গো"

—ইত্যাদি

ঘ। প্রসঙ্গ : মিথ :

এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত মিথগুলিকেও মহাশ্বেতা দেবী তুলে এনেছেন এই উপন্যাসে। যেমন—

> "অনেক অনেক চাঁদ আগে বীরসার পরদাদার পরদাদা, বুঝি তাদেরও পরদাদা এসেছিল ঘর বাঁধবার ঠাঁই খুঁজে খুঁজে। তখন জঙ্গল, পাহাড়, জমি পড়েই থাকত।........
>
> ওরা এসেছিল দু-ভাই-চটিয়া হারম আর নাগু। ....নদীর ধারেই ওরা চুটিয়া গ্রাম পত্তন করে। তাদের দু-ভায়ের নাম থেকে ক্রমে অঞ্চলটির নাম হল ছোটনাগপুর।"[৮]

ঙ। প্রসঙ্গ: লোক বিশ্বাস :

মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসও ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। এরা নিজের বিশ্বাসে বাঁচে। শালী যেমন বিশ্বাস করে বিরসার দাহ হওয়া ছাই জঙ্গলে ছড়িয়ে দিলে জঙ্গল জানবে বিরসা তাকে ভোলেনি, তেমনই বিরসার দেশের গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করে—

> "বীরসার দেশের সঙ্গে দুষ্ট আত্মা, নাগাসুবোঙ্গাদের কথা চালাচালি আছে। ওরা আরো জানে, ঝর্ণা-নালা দহ-বিলের বোঙ্গা নাগ্-ইরা থাকে, সে জলে স্নান করলে খেজেল-সুদ, খোস-সুদ পুঁড়ি সুদ- কোন না কোন জাতের কুষ্ঠ হবেই।"[৯]

চ। প্রসঙ্গ : লৌকিক দেবতা ও অপদেবতা :

উপন্যাসটি থেকে প্রচুর লৌকিক দেবতা ও অপদেবতার কথা জানা যায়। যেমন-সিংবোঙ ("ওরা জানত সিংবোঙ্গা সকল দেবতার উপরে")। পাশাপাশি পাওয়া যায় 'দুষ্ট আত্মা', নাগাসবোঙ্গার কথাও।

ছ। প্রসঙ্গ : লোকাচার ও লোক উৎসব :

উপন্যাসটিতে মুণ্ডারী লোকাচার ও লোক উৎসবের কথাও আছে। যেমন—শিকার,

মুণ্ডাদের 'করম' গান ও নাচ, শাল গাছের ফুল মাথায় নিয়ে মেয়েদের নাচ, পৌষ পূর্ণিমার 'মাগে' উৎসব পালন, করম উৎসব ইত্যাদি।

ঙ। প্রসঙ্গ : লোকবাদ্য :

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আছে মুণ্ডাদের কিছু লোক বাদ্যের কথাও। যেমন— বাঁশি ও টুইলা ("লাউয়ের খোলে তৈরী 'টুইলা' আর বাঁশি, দুটোই ওর বশ ছিল"[৮])।

চ। প্রসঙ্গ : লোকখাদ্য ও লোক দ্রব্য :

উপন্যাসটির বহু জায়গায় আছে মুণ্ডা জনজাতির খাদ্য দ্রব্যের কথা। এর অধিকাংশই বনজ। এদের খাদ্যের মধ্যেই এমন আছে ঘাটো, তেমনই আছে ঝি ভাজা, ঝিঁঝিদের ঘাস, বনফুলের তরকারি, বনকচু, কন্দ, খরা, শজারুর মাংস।

এরা যে সব জিনিস ব্যবহার করে, সেগুলি সবই প্রায় লৌকিক। আধুনিক যন্ত্রের ছোঁয়া সেগুলিতে নেই। এগুলির মধ্যে আছে কাঠের কাঁকুই, দোনা ইত্যাদি। দ্রব্যের কুসুমি তেল নিষ্কাশনের এদের নিজস্ব ২ পদ্ধতিও চোখে পড়ার মতো—

"ঘরে গিয়ে (বিরসা) দেখে মা মহুয়া বিচি উনুনে কুটছে আর কুটছে। মা বিচি কুটে, পিষে যা পিষবে। তবে তেল বেরুবে। ঘরে বাতি জ্বলবে।"[৯]

ছ। প্রসঙ্গ : লোকগণনা :

এরা অধিকাংশই হিসাব করে নিজস্ব পদ্ধতিতে। সাল-তারিখের হিসাব এরা রাখে না। এদের হিসাবের একক 'চাঁদ'। এদের হিসাব ১ চাঁদ =১২ বছর। ধানীর কথায়— "এক কুড়ি বারো চাঁদ হয়, তা নিয়ে বুড়া।"[১০]

জ। প্রসঙ্গ : ভাষা ছাঁদ :

নিজের এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী মুণ্ডাদের ভাষা ছাঁদটিকে অপূর্ব দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। যেমন—

> "রাতে দাদার পাশে শুয়ে বীরসা বলে, 'তুই সেথা আরান্দি করবি?'
> 'হাঁ রে।'
> 'মেয়েগুলা দেখতে কেমন?'
> 'ভাল না; গিদা গিদা কথা বলে, ঝিমা ঝিমা কাজ করে, নিদা নিদা হাঁটে।'"[১১]

পাশাপাশি উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে কিছু মুণ্ডারী শব্দও। যেমন— 'আরান্দি' (বিয়ে), 'আবা' (বাবা), 'মানকি' (মণ্ডল/মোড়ল)।

এইভাবে সমগ্র উপন্যাসে উঠে এসেছে মুণ্ডারী জীবন, অর্থাৎ অঞ্চলের আঞ্চলিকতা তথা 'Local Colour'. উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বিরসা, তাঁর সময়, তাঁদের 'উলগুলান'-এর সাথে পরিচিত হতে গিয়ে পাঠকগণ মুণ্ডারী সমাজের যে লোক জীবনের পরিচয় পান, বলাই যায় যে, তা পরম সৌভাগ্যের উপরি পাওনা।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়	অসিতকুমার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ২০০৬-০৭, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪০২
২. চৌবে	কৃপাশঙ্কর, মহাঅরণ্যের মা, প্রথম, কলকাতা।
৩. দেবী	মহাশ্বেতা, অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৬

৪. তদেব, পৃ. ৫
৫. তদেব, পৃ. ২২
৬. তদেব, পৃ. ৪২-৪৩
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. তদেব, পৃ. ৩০
৯. তদেব, পৃ. ৩০
১০. তদেব, পৃ. ২৬
১১. তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯

'বীরসা', না, 'বিরসা'-এই নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী উল্লেখ করেছেন—"...আর শেষ কথাটি বলব 'বীরসা' নাম প্রসঙ্গে। আমি লিখেছিলাম 'বীরসা'। সঠিক বানান হবে 'বিরসা'। বৃহস্পতিবার যে ছেলে জন্মায় তাকেই বিরসা নাম দেওয়া হয়। জন্মবারের সঙ্গে মিলিয়ে বালক-বালিকার নাম দেওয়া খুব প্রচলিত আদিবাসী এবং অন-আদিবাসী সমাজে" ([illegible] : অক্টোবর ২০০৬)। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত বানানে 'বিরসা'ই লিখলাম।

লেখক-পরিচিতি

রুশতী বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভাগীয় প্রধান, বাংলাবিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবীণ কুমার সরকার : সহশিক্ষক, ঢোলা হাইস্কুল
প্রণব দেবনাথ : গবেষক
রামকৃষ্ণ মণ্ডল : ছাত্র, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির
মুন্না সিংহ : সহশিক্ষিকা, আত্রেশবাগ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল
তরুণ হালদার : গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
অর্জুন বণিক : গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
সাহবিন রহমান : অধ্যাপক
সমরেশ দাস : গবেষক
বৃন্দাবন মণ্ডল : গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
তুর্য মজুমদার : গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
সিদ্ধার্থ পাঁড়া : অধ্যাপক
তুহিন ঘোষ : অধ্যাপক
মিন্টন সমাদ্দার : গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
মেহেবুব হোসেন : গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
গৌতম হাজোয়ার : গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
শৌভিক কুণ্ডু : গবেষক
নীতুল সরকার : গবেষক, কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়
দেবাকৃতা সরকার : গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
সজীব কুমার সরকার : গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অয়নাভ মিত্র : গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
মহ. সইফুল ইসলাম : গবেষক
সুব্রত দাস : গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্বজিৎ মণ্ডল : গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
মহ. আসরাফ আলম : গবেষক রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির
কুশল চ্যাটার্জী : গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির।

৩

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বসিরহাট কলেজের উদ্যোগ

ISSN 2349-9486

ষাণ্মাসিকী

বঙ্গলোক

Shanmashiki Bangalok

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বসিরহাট কলেজের উদ্যোগ

ISSN - 2349-9486

ষাণ্মাসিকী বঙ্গলোক

Shanmashiki Bangalok

৩

বর্ষ ২ । সংখ্যা ৩

নভেম্বর ২০১৫ - এপ্রিল ২০১৬

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বসিরহাট কলেজ

পোস্ট অফিস : বসিরহাট কলেজ। বসিরহাট।

উত্তর চব্বিশ পরগনা। ডাক-সূচক ৭৪৩৪১২

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় । 5

সাহিত্যলোক

ভাষাচর্চা

কৌশিক পণ্ডা

সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে পূর্ব-মেদিনীপুরেরএকটি গ্রামের ভাষা। 9

কবিতার ভুবন

হিমাদ্রি মণ্ডল

মেঘনাদবধ কাব্যে সংস্কার ও কুসংস্কার। 18

কুশল চ্যাটার্জী

২১ ফেব্রুয়ারির কবিতা। 29

সুরজিৎ ঘোড়ই

বাংলাদেশের কবিতা : ফিরে দেখা ইতিহাস । 36

অভিষেক মণ্ডল

মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে : নিয়তি অতিক্রান্ত স্বর । 40

কথাসাহিত্য

বিদিশা ঘোষ

সেইপদপল্লবমুদারং । 48

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের গণদেবতা । 60

দেবাশীষ দত্ত

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিতমানস : ব্যক্তির চাহিদার ক্রমবিকাশ । 75

রেহানা খাতুন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : নিবিড় পাঠ—তারিণীর বাড়ি-বদল । 78

ঈশিতা খাঁ

কল্পবিজ্ঞানের লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ । 84

ফেব্রুয়ারির একুশ ও কিছু বাংলা কবিতা

কুশল চ্যাটার্জী

১

মা, মাতৃভাষা, দেশ এই শব্দগুলি সমার্থক। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় এই তিনটি শব্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিশু মাতৃক্রোড়ে নিজেকে সব থেকে সুরক্ষিত মনে করে। মাতৃস্তন্যদুগ্ধ পানে তার পুষ্টি শুরু হয়। ধীরে ধীরে বড় হতে হতে সে মাতৃভাষা রপ্ত করতে থাকে। মাতৃভাষা তখন থেকে তার মনের ভাব প্রকাশের ভূমি।

শিশু অবস্থায়, পরিবার বা সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় তার যেমন 'বোধ' গড়ে ওঠে, তেমনই সে অবচেতনে শিখতে থাকে একান্ত আপন মাতৃভাষাকে। কখনও পরিবারের সদস্য-সদস্যারা শিশুকে শেখান মাতৃভাষার টুকরো টুকরো শব্দ, কখনও সমাজ থেকেও সে মাতৃভাষা রপ্ত করতে থাকে। ধীরে ধীরে শিশু নিজে নিজেই বলে অর্থহীন বাক্য বা বাক্যাংশ। এরপর এমন এক দিন আসে যেদিন সবাই অবাক করে দিয়ে শিশু শুদ্ধ বাক্য বলতে থাকে। নিজের অজান্তেই শিশুর সাথে এক সুরে গাঁথা হয়ে যায় মাতৃভাষা। মাতৃভাষা তার সত্তায় মিশে যায়।

কিন্তু মাতৃভাষার দাবিতে 'আন্দোলন'? 'মাতৃভাষা'—'ভাষা' ও 'আন্দোলন' শব্দ দু'টির পারস্পরিক অবস্থান এতো দূরবর্তী, যে টেনে-হিঁচড়ে কাছে আনলেও অর্থ দাঁড়াত না। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ও এর পেছনে সামাজিক, রাষ্ট্রিক তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এমনই এক পটভূমি তৈরি করে দেয়, যাতে করে সহজেই উক্ত শব্দ দু'টি পাশাপাশি বসতে পারলো, আর শুধু বসলই না, নিজস্ব একটা অর্থবলয়ও তৈরি করলো। এখন তাই 'ভাষা আন্দোলন' বা 'মাতৃভাষা আন্দোলন' অর্থহীন কেবল কোনো শব্দবন্ধ নয়, বরং বলা যায়, বহু বলা, বা, না বলা কথা তথা ইতিহাসের স্মারক এটি।

২

উর্দু ভাষাটির সাথে মুসলমান সম্প্রদায়ের যে অনাদি কালের যোগ ছিলো, তা বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কিছু মুসলিম ব্যক্তিত্ব, যেমন-সলিমুল্লাহ, সৈয়দ আহমেদ খান প্রমুখের চেষ্টায় এই ভাষা তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কায়' উন্নীত হয়। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে এই ভাষার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। কিন্তু বাংলার মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন। জানা যায় ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে বাংলার মুসলিমরা উর্দুকে তাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কায় পরিণত করার বিরোধিতা করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলি ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ৪টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়-

ক. ভারত

খ. বার্মা (বর্তমানের মায়ানমার)

গ. সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা)

ঘ. পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একত্রে)

দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এর বাংলাভাষী ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ

৬ কোটি ৯০ লক্ষ জন বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মিলনে একটি ঘোষণাপত্রে উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীরা এর বিরোধিতা করেন। তাঁরা বাংলাকে ভাষার দাবি করেন। কিন্তু পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে অনুমোদন দেয় না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান মালিক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বানানোর জন্য ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের একটি বিশাল সমাবেশ হয়। সেখানে বাংলাকে 'রাষ্ট্রভাষা' স্বীকৃতি-দানের দাবি জানানো হয়। ডিসেম্বরের শেষ দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। আসলে উর্দু যে কোন অংশেই পাকিস্তানের ভূমিজ ভাষা ছিল না, তা জানিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন — 'আমাদের যদি একটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা উর্দুর কথা বিবেচনা করতে পারি।'

ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে উর্দু ভাষা ও বাংলা ভাষার লড়াই, যার আসলে তাত্ত্বিক ব্যক্তিগত কোন শর্ত বা দাবির কোনটাই ছিল না। ১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা করা ও সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্যে একটি সংশোধনী আনেন গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একে সমর্থন জানালেও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এতে জল ঢেলে ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র উর্দু হতে পারে।' ফলত সংশোধনীটি বাতিল হয়ে যায় ভোটে।

শুরু হয় ঢাকায় আন্দোলন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। ২৯শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালিত হয়। মিছিলে লাঠিচার্জ করা হয়। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে দ্বিতীয়বারের মত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১১ই মার্চ পুনর্বার ধর্মঘটের। জায়গায় জায়গায় চলে বিক্ষোভ। সেনাবাহিনী তলব করে বিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা করা হয়। ঘটনা পরম্পরায় গ্রেপ্তার হন শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখেরা।

১১ তারিখের এই ঘটনার পর ১২ থেকে ১৫ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ই মার্চ বিক্ষোভ বিরোধীদের মুখপাত্র খাজা নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠক করে ৮টি বিষয়ে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তাতে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষার দাবিটি গ্রহণ করা হয়নি। ১৯শে মার্চ ১৯৪৮-এ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্না ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়।' ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি এই ধরনের বক্তব্য পেশ করেন। পরে অবশ্য সংগ্রাম পরিষদের নেতারা জিন্নার সাথে দেখা করে স্মারকলিপি দেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। জিন্না খাজার সাথে চুক্তিটি 'চাপ'-এর দ্বারা সংঘটিত বলে বাতিল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় বাংলাকে লেখা হবে আরবি হরফে।

২

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫২ সাল ২৭শে জানুয়ারি) খাজা নাজিমুদ্দিন (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী) ঢাকায়

পল্টন ময়দানে যে ভাষণ দিলেন, তাতে জনগণ শুনলো কিছুদিন আগের জিন্নার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। আবার বিক্ষোভ শুরু হল। বিরোধিতা করা হয় আরবি লিপিতে বাংলা লেখারও। পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিটিং-মিছিলের পরিকল্পনা নেয়। ওদিকে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি যে ঘটনা ঘটেছিলো, তার পেছনেও কম নাটকীয়তা ছিলো না। সকাল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রাথমিক ভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের ভোটে ১১-৩৩ ভোটে স্থগিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কিন্তু ছাত্র গ্রেপ্তার হলে আরও তীব্র আকার নেয় অসন্তোষ। দুপুর ২টায় আইন পরিষদের সদস্যরা আইন সভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাঁদের বাধা দেয়। কিন্তু ছাত্র চেয়েছিলো আইন সভায় গিয়ে তাদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করতে। কিন্তু দুপুর ৩টে নাগাদ পুলিশ দৌড়ে এসে ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই নিহত হন আব্দুল জব্বার ও রফিক আহমেদ। এছাড়াও নিহত হন আব্দুস সালাম, আবুল বরকত সহ আরও অনেকে। নিহত হয় অহিউল্লাহ নামে ৮/৯ বছরের এক কিশোরও।

২২শে ফেব্রুয়ারি দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। বের হয় শোক মিছিল। সরকার সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, কমিউনিস্ট ও পাকিস্তান-বিরোধীদের চক্রান্তে ছাত্ররা পুলিশকে আক্রমণ করেছে। ছাত্র-গ্রেপ্তার কিন্তু বন্ধ হল না। ২৫শে ফেব্রুয়ারি আবুল বরকতের ভাই একটি হত্যা মামলা দায়ের এর চেষ্টা করেন। কিন্তু উপযুক্ত কাগজ-পত্রের অভাব দেখিয়ে সরকার মামলাটি গ্রহণ করেনি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ মিনার তৈরির কাজে হাত দেয়। এটি শেষ হয় ২৪ তারিখ ভোরে। এর গায়ে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। এটি তৈরি হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। এটি ছিলো ১০ ফুট উঁচু আর ৬ ফুট চওড়া। এটি জি.এস.শরফুদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। এটির নক্সা অঙ্কন করেছিলেন বদিউল আলম। তাঁদের সঙ্গ দিয়েছিলেন শহীদ হালদার। ওই দিন (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে শহীদ শফিউরের পিতা আনুষ্ঠানিক ভাবে এর উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এইদিন কিন্তু পুলিশ ও পাকিস্তানী সেনা বাহিনী এটা ভেঙে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। কিন্তু এটিও পরে ভেঙে দেওয়া হয় (অবশেষে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে ১৯৫৭ সালে সরকারি ভাবে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়)।

অতঃপর সংবিধান সংশোধিত হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ই মে মুসলিম লীগের সমর্থনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে সংবিধানে সংশোধন করা হয় ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি। সংবিধানের ২১৪(১) অধ্যায়ে 'রাষ্ট্রভাষা' সম্পর্কে লেখা হয়, —"যদিও আয়ুব খানের প্রতিষ্ঠিত সামরিক সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল; ১৯৫৯ সালের ৬ই জানুয়ারি সামরিক শাসকগোষ্ঠী এক সরকারি বিবৃতি জারি করে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উল্লিখিত দুই রাষ্ট্রভাষার উপর সরকারি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।"*

এইভাবে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা তার সম্মানের আসনে আসীন হন। ২০০০ সালে ইউনেস্কো এই দিনটিকে (২১ শে ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে

ঘোষণা করেন।

৩

বলা হয়, 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ'। কারণ সমাজে ঘ'টে যাওয়া ঘটনা, সামাজিক ... সমাজের চরিত্র নিয়েই সাহিত্য গড়ে ওঠে। আর সমাজের প্রধান উপাদান যে মানুষ, সাহিত্য ... মানুষেরই সৃষ্টি, আবার মানুষের জন্যেও সৃষ্টি। নানান সময়ের নানা ঘটনা, আন্দোলন, ... সামাজিককে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। আর তাই মহাশ্বেতা দেবী'র 'অরণ্যের অধিকার' ... ও মুন্ডা বিদ্রোহের কথা, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' [মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে ... বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' [সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা] -এর মত সাহিত্যগুলি আলাদা আলাদা ... জনমানসে, যে ভাষা আন্দোলনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথা রাজনৈতিক ... যে সাহিত্য রচিত হবে, এ আর নতুন কথা কী। বিশেষত এই আন্দোলনের সাথে মিশে ... আবেগও। ভাষা আন্দোলন নিয়ে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে সাহিত্যেরই বিভিন্ন শাখায়। ... লেখায় বাংলা কবিতায় কীভাবে ভাষা আন্দোলন বা এর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তা নিয়ে ... আলোচনা করা হবে।

মাতৃভাষা ও মা মানুষের কাছে সমীকৃত। মাতৃভাষা চৌচির, ছিন্ন থেকে ছেঁড়ে ... ধ্বংসের ষড়যন্ত্র নিয়ে শাসকের রক্তচক্ষুর সামনে সাধারণ মানুষ অসহায়। তাই তাদের ...

> মাগো
>
> ওরা বলে,
>
> সবার কথা কেড়ে নেবে,
>
> তোমার কোলে শুয়ে
>
> গল্প শুনতে দেবে না
>
> বলো, মা
>
> তাই কি হয়? ('কোনো এক মাকে' -আবু জাফর ওবায়েদুল্লাহ)

শাসক সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে নিজের পছন্দের ভাষা সেখানে ... দিতে চান। এই ভাবে ভাষার ওপর কব্জা ক'রে ধীরে ধীরে মানুষের সমাজের ওপরেও ... আধিপত্য কায়েম রাখার কৌশল নেন তাঁরা। তখন এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হয় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ... কথা বলার স্বাধীনতাকেও এই ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে আসা যাবে-

> এসো, ছিনিয়ে নিই আমাদের স্বাধীনতা
>
> কথা বলার স্বাধীনতা, ... ('নাশী থেকে শোনা বাক' -সৈয়দ শামসুল হক)

রবিশুল হাসান এমন লিখেছিলেন ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গে—

"শিশু ভাষা প্রাণ আর অনেক রক্ত ঝরানো বায়ান্নোর ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশেষ একটি তাৎপর্য লাভ করেছে।"

কবিতায় উঠে এল এই দৈন্যদশা চিত্রও —

> 'ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
>
> দুপুর বেলার অক্ত
>
> বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?' ('একুশের কবিতা' -আল মাহমুদ)

যা বলে এর আন্দোলন, এত রক্ত, সেই ভাষা ও তার কর্মধারা আর নিয়মে থাকে না। [illegible]

সমাসোক্তি অলঙ্কারে ভূষিত নিম্নোক্ত পঙক্তিটিতে কবি নিজের অন্তরের কথাই ব্যক্ত ক'রে বলেছেন—

বর্ণমালা বর্ণমালা মুখটি তুলে চাও
সোনার ছেলে শহীদ হল অশ্রু মুছে দাও।

('বর্ণমালা ও বর্ণমালা' -শেখ আতাউর রহমান)

বাংলাভাষা-মায়ের সোনার ছেলেরা তাঁর সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রাণ দিয়ে শহীদের মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁদের রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে তাই মাতৃভাষা হয়েছেন গরবিনী-

উনিশ শো বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।

('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' -শামসুর রাহমান)

যে ভাষার জন্যে প্রাণ যায়, রক্ত ঝরে সেই ভাষার একটা আলাদা পরিচয় তৈরি হয়, নাম হয় তাঁর 'খুন রাঙ্গানো'-

ভাই হারানোর কি যে ব্যথা
হৃদয় জুড়ে ক্ষত
ভাষা আমার খুন রাঙ্গানো
রক্ত জবার মতো। ('স্মৃতির মিনার'-উত্তম মিত্র)

মাতৃভাষার জন্যে যে তারিখে রক্ত ঝরে, সে তারিখটি বছরের অন্যান্য তারিখের থেকে আলাদা হয় তাৎপর্যে, বলা যায় তার তাৎপর্য হয় অসামান্য-

একুশে আমার রক্তে ভেজা
মায়ের মুখের ভাষা
একুশ আমার স্বপ্ন প্রদীপ
আলোর মিছিল আশা।" ('একুশ আমার'-মানিক চক্রবর্তী)

মাতৃভাষা আমাদের কাছে নয়নের মণি, আদরের ধন। তাই এটিকে ঘিরে, এটিকে নিয়েই আমাদের স্বপ্নের শেষ নেই-

মুখের ভাষায় বলবো কথা, মুখের ভাষায় হাসবো
এই ভাষাতে আকাশ জুড়ে ইচ্ছে মত ভাসবো
... ...
মুখের ভাষার জ্ঞান গরিমায় বিশ্ব জুড়ে ঘুরবো
চাঁদ পেরিয়ে মঙ্গলেও বিমান যানে উড়বো

('মুখের ভাষা' -মানিক মহম্মদ রাজ্জাক)

কিন্তু এত ভুললে চলবে না-

মুখের ভাষার জন্য আমার ভাই হয়েছে লাশ
ভাইকে ভোলার মতো কারো নেই তো অবকাশ

মাতৃভাষা-বাংলাভাষা আমাদের কাছে বরণীয়, আদরণীয়, এর ব্যাপ্তি সারা জীবনময়। তাই তো বাংলা ভাষায় সুখের বাতাস তৃপ্তি ছড়ায় বুকে ('বাংলা ভাষা'-শাহনাজ রুবীনা রত্না)। কিন্তু বাংলা ভাষার গায়ে যে রক্তের দাগ স্পষ্ট।

বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা
দেশের গরব ভাষা,
বাংলা আমার মাতৃভাষা
ভাইয়ের রক্তে কেনা ('ভাইয়ের রক্তে কেনা'-শিব ...)

মাতৃভাষা আমাদের মা। তাঁর জন্যে রক্তদান করা তো গর্বের কাজ-

তাই বাঙালি বীরের জাতি
প্রথিত বিশ্বে
ভাষার জন্যে প্রাণ দিই
এই তো আমরা বীরের' ('মাতৃভাষা'-রহমান হাবিব)

মাতৃভাষার প্রতি আমাদের আবেগ অপরিসীম। আর এই আবেগেরই উদার বহিঃপ্রকাশ ... হয় নিম্নোক্ত কবিতাংশে-

বাংলা ভাষা নিয়ে আমার
মস্ত বড় আশা
বাংলা ভাষা হতো যদি
আন্তর্জাতিক ভাষা।
ইংরেজিটার থাকত না আর
বিশ্বে কোন দাম;
জানত সবাই দেশে দেশে
বাংলা ভাষার নাম। ('দেশে দেশে বাংলা ভাষার নাম'-পুষ্পিতা ...)

মা ও মাতৃভাষা আমাদের কাছে সব মর্যাদার দাবি রাখে। এই মাতৃভাষার জন্য আমাদের নিবেদিত প্রাণ আমরা ... পায়। সেই সূত্র ধরেই ২১শে ফেব্রুয়ারি তাই অমর দিন। মর্যাদায় ভূষিত, নানা সজ্জায় হয় সজ্জিত-

একুশ মানে বুকের মাঝে
ভাই হারানোর ব্যথা,
রক্ত দিয়ে লিখে রাখা
বাংলা ভাষার কথা। ('একুশ মানে'-উত্তমকুমার মিত্র)

আবার এও কী বলা যায় না?

একুশ আমার মুক্ত স্বাধীন
একুশ আমার স্বাধিকার
একুশ আমায় দিয়েছে
কথা বলার অধিকার। ('আমার একুশ'-মো: উজ্জ্বলুর রহমান লিখন)

ক্ষমতা হাতে রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের যে দ্বন্দ্ব তারই প্রকাশ ... 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।' দিন আসে, দিন চলেও যায়। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচিতি ও বিশিষ্টতা নিয়ে থেকে যায় ২১শে ফেব্রুয়ারি। আসলে-

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি।
আমি কি ভুলিতে পারি। (আবদুল গাফফার চৌধুরী এটি লেখেন ও সুর দেন আলতাফ মাহমুদ ...

তথ্যসূত্র :

১. Upadhay, R (2003-05-01)-"Urdu Controversy-is dividing the nation further". Papers South Asian Analysis Group

২. 'দৈনিক আজাদ', ২১ জুলাই, ১৯৪৭

৩. 'Pakistan Period (1947-71), James Heitzman and Robert Worden (eds.)-1989 & Sayeed, Khalid Bin (September 1954-"Federalism and Pakistan." Far Eastern Survey 23 (9): P. 139-143.

৪. মালেক আব্দুল (২০০০)। হোসেন, আবু মহম্মদ দেলোয়ার (সম্পাদক)। "ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস'। ঢাকা : সেলিনা হোসেন, পরিচালক, গবেষণা সংকলন, ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমি, পৃ ৫-২৭।

৫. Lambert, Richard, D. (April 1959) 'Factors in Bengali Regionalism in Pakistan Far Eastern Survey 28 (4) : P. 49-58.

৬. 'হৃদয়ে অমর একুশে ও মুক্তিযুদ্ধ'

৭. হাসান-উজ-জামান-'সমকালীন বাংলা সাহিত্য'

গ্রন্থপঞ্জি :

বাংলা গ্রন্থ :

১। ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস-আবদুল মালেক।

২। একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস-আহমদ রফিক।

English Books :

1. The Urdu-English Controversy in Pakistan-Rehman Tariq.
2. De-Pakistanisation of Bangladesh-R. Upadhyay.

পত্র-পত্রিকা :

১. দৈনিক আজাদ, এপ্রিল ২১, ১৯৫৩।

২. দৈনিক আজাদ, এপ্রিল ২১, ১৯৫৪।

৩. দৈনিক আজাদ, এপ্রিল ২২, ১৯৫৪।

বসিরহাট কলেজ

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

পোস্ট অফিস বসিরহাট কলেজ । বসিরহাট । উত্তর ২৪ পরগনা । পিন ৭৪৩৪১২

দূরভাষ ০৩২১৭ - ২২৮ ৫০৫

এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, শ্রী কুশল চ্যাটার্জী, অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভনিং কলেজ, নৈহাটী ; বসিরহাট কলেজের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ষাণ্মাসিকী বঙ্গলোক(ISSN No.2349-9486)-৩য় সংখ্যায় '২১ ফেব্রুয়ারির কবিতা' শিরোনামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন।

কিন্তু ঐ সংখ্যায় লেখক পরিচিতি অংশে শ্রী কুশল চ্যাটার্জী'র পরিচয় ও কলেজের নাম অনিচ্ছাকৃত/ভ্রান্তিবশত চুক্তিভিত্তিক পূর্ণসময়ের অধ্যাপিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নহাটা কলেজ মুদ্রিত হয়েছে । এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

(রাজ কুমার দাস)

সম্পাদক

ষাণ্মাসিকী বঙ্গলোক।

ও

বিভাগীয় প্রধান

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বসিরহাট কলেজ।

তারিখ: ২৬.০২.২০১৬

বিভাগীয় প্রধান
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বসিরহাট কলেজ

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যচর্চার নানা পথ

Proceedings of A National Seminar
Sponsored by University Grants Commission,
Organised by Department of Bengali Literature and Language
Basirhat College, P.O.-Basirhat College, Basirhat, PIN-743412
Collaborator : Antorjatik Pathsala,
On Different Avenues of Post-Independence
Bengali Theatre

SWADHINATA-UTTOR BANGLA NATYACHARCHAR NANA PATH

Publication on : 11 March, 2016

প্রকাশ
১১ মার্চ ২০১৬

প্রকাশক
খাইরুল আলম ।। ড. কপোতাক্ষী সুর
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বসিরহাট কলেজ ।। পাঠশালা প্রোডাকশন

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. অদীপ কুমার ঘোষ, গৌতমলাল মুখোপাধ্যায়, ড. সোমা পাল চাকী, চিন্ময় ঘোষ, সঙ্গীতা মণ্ডল, সংযুক্তা বালা, গোবিন্দ বণিক, শুভেন্দু শেখর নস্কর, অরিন্দম মণ্ডল, অমিত রায় (আন্তর্জাতিক পাঠশালা), ড. কপোতাক্ষী সুর (আন্তর্জাতিক পাঠশালা)

সম্পাদকীয় দপ্তর
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বসিরহাট কলেজ। পোস্ট অফিস : বসিরহাট কলেজ। বসিরহাট। উত্তর চব্বিশ পরগনা। ডাক-সূচক ৭৪৩৪১২

বর্ণগ্রন্থন ও মুদ্রণ
সুব্রত সমাদ্দার (৯৩৩৯১১৫৬১০)
থার্ডআই, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯

ISBN : 978-93-85233-01-2
বিনিময় : ৩৫০.০০

সূ চি প ত্র

কথারম্ভ । ৯

আলোচনার প্রতিবেদন । ১৩

অভ্যর্থনা সমিতি । ১৪

মূ ল আ লো চ না

শাঁওলী মিত্র

নবনাট্য ও সৎনাট্য: চল্লিশের দশকের ও পঞ্চাশের দশকের আন্দোলন । ১৭

সৌমিত্র বসু

শম্ভু মিত্রের নাট্যভাষা । ২৯

শান্তনু সরকার

বাদল সরকার ও তাঁর থার্ড থিয়েটার । ৩৫

উপস্থাপিত নিবন্ধ

না ট্য জ গ ৎ

কুশল চ্যাটার্জি

নাটক নিয়ে কিছু কথা : ১৯৫০-১৯৮০ । ৪৩

পুষ্প বৈরাগ্য

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকের অভিমুখ । ৪৬

ড. সোমা ভদ্র রায়

স্বাধীনতা পরবর্তী অ্যাবসার্ড নাটকের গতিমুখ । ৫০

ড. নির্মাল্য মণ্ডল

বাস্তববুদ্ধি ও বিবেকের নাট্যিক দ্বৈরথ : সমাধানহীন আত্মসমীক্ষা । ৫৫

ড. মহ. কুতুবুদ্দিন মোল্লা

স্বাধীনতা, বাংলা ভাগ—উদ্বাস্তু শিক্ষকের করুণ কাহিনি : সলিল সেনের নাটক । ৬৩

মহ. আব্দুল্লা গাজী

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকের সামাজিক অস্থিরতা ও দেশবিভাগ । ৬৭

ড. সুব্রত দাস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নাটক । ৭২

সমাধান শিকারী

সেলিম আল দীনের নাটক । ৭৭

ড. উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল

স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলা নাট্যচর্চার বিবর্তনে নাট্যকার সলিল সেন । ৭৯

সুরজিৎ ঘোড়ুই

বাংলা পথনাটক : রূপে রূপান্তরে । ৮১

নাটক নিয়ে কিছু কথা : ১৯৪০-১৯৮০

কুশল ভাটিয়ি

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশেরা মেতে উঠল মহারণে। অন্যান্য দেশেরা মহারণের প্রত্যক্ষ অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে দুর্ভাগ্যের রূপ ধারণ করল। ইংরেজদের 'উপনিবেশ' ভারতবর্ষের অবস্থা তখন শোচনীয়। উপনিবেশ-প্রভুর 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা'য় শোচনীয় অবস্থা তার। বাংলায় এর প্রভাব পড়ল মারাত্মক। ক্ষুধা, মহামারি, কালোবাজারি সব মিলিয়ে বাংলার তখন শ্রীহীন কায়া। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন বুদ্ধিজীবীরা। লেখকের কলম থেকে বেরিয়ে এল নিঃস্ব বাংলার চিত্র। যে গ্রাম একদা ছিল 'ধুধু জানা ছায়ায় ঢাকা', সেখানে 'তোমরা যেত গুনগুনিয়ে যেতো ফুলের মাঝে', আর 'আকাশে বাতাসে লেখা ছিল / পাকা ধানের বাসে বাসে / সবার নিমন্ত্রণ / সেথানে বার মাসে তের পার্বণ / আষাঢ় শ্রাবণ কী বৈশাখে / গাঁয়ের বধূর সবের ডাকে / লক্ষ্মী এসে ভরে দিত সোনা সবার ঘরে ঘরে' কিন্তু হঠাৎ সেখানে 'ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী / এলো পিশাচেরা এলোরে / ...কুটিলেরও মন্ত্রে শোষণেরও যন্ত্রে / গেল প্রাণ শত প্রাণ গেলরে।' যুদ্ধে অভিঘাত তো ছিলই, তার পাশে 'কুলি'দের শোষণে, কালোবাজারিতে ছারখার হল সমাজ। কৃষক হল ভূমিহীন। এই সময় এক শ্রেণির মানুষ শৈল্পিক প্রতিবাদ নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁদের শিল্পচর্চার পুরোভাগে রইল এই সব নিরন্ন খেটে খাওয়া শোষিত মানুষজন। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি-র লেখক গোষ্ঠীর লেখায় এদের অবশ্য আগেই স্থান হয়েছিল। ফ্যাসি-বিরোধী শিল্পীকুল এক জায়গায় সমবেত হয়ে গড়ে তুললেন ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ। এরপর ১৯৪৩ সালের ২৫শে মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ *(Indian People's Theatre Association, IPTA)* জন্ম হয়, আসলে 'It is a movement which seeks to make our arts the expression and organism of our people's struggle for freedom economic justice and a democratic cluture.'

এই গণনাট্য সংঘ গভীর ভাবে প্রভাবিত হল মার্কসীয় ভাবনা দ্বারা। গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন বিজন ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর নবান্ন নাটকের প্রেক্ষাপট হিসাবে যা বলেছিলেন, সেটাকেই কিছুটা গণনাট্যের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট হিসাবে ধরা যায় - 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এশিয়ার যে গণ অভ্যুত্থান দেখা গিয়েছে তাতে ভারতেরও মোহভঙ্গ হয়েছে।... তাই ১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে দেশ ব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হল, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ভারতের

বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিয়মতন্ত্রসম্মত ভাগ-বাটোয়ারার পর নিরন্নের স্বাধীনতা এখন কালনেমীর অভিশাপ বহন করে।'

গণনাট্যের কথা বলার জন্যে একে একে বিজন ভট্টাচার্য সৃষ্টি করলেন *আগুন* (১৯৪৩), *জবানবন্দী* (১৯৪৩), *নবান্ন* ১৯৪৪)। ১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে শ্রীরঙ্গমে *নবান্ন* নাটক অভিনীত হল। নাটকে নিজেদের কথা তথা নিজেদের দেখতে পেয়ে '...হৈ হৈ উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছে গ্রামের কৃষকরা। ... শুরুতেই দর্শক আসনগুলি হয়ে প্রথম দৃশ্যের চমৎকারিত্ব উপভোগ করতে থাকে।' এই ভাবে গণনাট্যের ধ্যান-ধারণায় লালিত বহু নাট্যকার এলেন তাঁদের রচনা নিয়ে। এঁদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী (*দুঃখীর ইমান*-১৯৪৭, *পথিক*-১৯৫১, *ছেঁড়া তার*-১৯৫০), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (*দীপশিখা*-১৯৪৪, *তরঙ্গ*-১৯৪৪) প্রমুখ। গণনাট্যের হাত ধরেই নবনাট্যের জন্ম। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধাচরণ, দারিদ্র্য ইত্যাদি স্থান পেল এতে। এরপর ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হলেন বহু প্রতিভাধর নাট্যকার। এঁদের মধ্যে সলিল সেন (*নতুন ইহুদী*-১৯৫১), *উৎসর্গ*-১৯৬৮) ধনঞ্জয় বৈরাগী তথা তরুণ রায় (*দুরবাস্তু*-১৯৫৭, *রুপালি চাঁদ*-১৯৫৮, *রজনীগন্ধা*-১৯৬০), বীরু মুখোপাধ্যায় (*সংক্রান্তি*-১৯৫৯, *সাম্প্রতিক*-১৯৬০), শম্ভু মিত্র (*বিভাব*-১৯৫৬, *ঘূর্ণি*-১৯৬৬), ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের লেখাতেই কম-বেশি ধরা পড়েছে জীবনের জটিলতা, দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনার চিত্র। এর পাশাপাশি চলল একাঙ্ক নাটক রচনার বহর। যদিও আগেও কিছু একাঙ্ক নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু এই সময়ে এর ব্যাপকতা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় অনাদি বসু (*আলোর নিশানা*-১৯৭৯, *বিবর্তন*-১৯৮০), অমল রায় (*এদেশেও নর্মান বেথুন*-১৯৭৮, *বিদ্রোহের থিয়েটার*-১৯৮০) প্রমুখের নাম।

একাঙ্ক নাটকের পাশাপাশি দেখা গেল আর একটি নাটকের ধারা। সেটি কাব্যনাটক। এই ধারায় প্রথমেই নাম করতে হয় গিরিশঙ্করের। তাঁর কাব্যনাটকগুলি হল - *চেনা বিবির হাট* (১৯৫৯), *সঙ্কটের ছায়া* (১৯৬০) ইত্যাদি। এছাড়াও রাম বসু (*নীলকণ্ঠ*-১৯৫৭), শিপ্রা পাল (*দেশান্তরে অন্ধকার স্মৃতি নিঃসঙ্গতা*-১৯৬৮), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (*সোনার চাবি*-১৯৭৩, *বর্ণ বিপর্যয়*-১৯৭৩) প্রমুখরাও বিশেষ ভাবে এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাট্যকার।

এর সাথে বাংলায় লেখা হল অ্যাবসার্ড নাটক। বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা এই ধারায় নাটক লিখে বিখ্যাত হলেন।

২

১৯৪০ থেকে ১৯৮০- সাল পর্যন্ত যে যে নাটক তথা থিয়েটারি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, সেগুলির কয়েকটি দিক নিয়ে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক -

চল্লিশের দশকে বিশেষ সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক পরিস্থিতির জন্য হয়েছিল গণনাট্য - নবনাট্যের। কিন্তু স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের দশকে

পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়। ইংরেজরা তখন আর অন্যতম factor থাকলেন না। তাছাড়া কালোবাজারি, শ্রমিক-শোষণ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আর আগের মত থাকল না। ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকল গণনাট্য - নবনাট্যের মানকতা। যদিও তুলসী লাহিড়ীরা লিখে গেলেন। আর একটা কারণেও গণনাট্য কিছু কমিউনিস্ট ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত। আবার ১৯৪৮ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ বলেও ঘোষিত হয়। এই সময় জানা যায় যে, ডা. বিধানচন্দ্র রায় নাকি জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের গোপনে নির্দেশ দেন গণনাট্য সংঘের অভিযান বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য। ['Should any attempt be made by them to stage drama or other performance in public places, these should be stopped by District Magistratges as far as possible by the use of the Dramatic Performances Act 1876 (No.XIX1876)...

District Magistrates are hereby empowered to take action under Section : 3 of the Dramatic Performances Act on their own initiative.' -- Express Letter No.511 (13) Pr. S/100/49.dt.17 June,1949]

কেউ কেউ আবার নিজেদের নাটককে রাজনৈতিক মতাদর্শের বাহক হিসাবে গ্রহণ করলেন। যেমন - উৎপল দত্ত। ফলত খুব স্থূল অর্থেই হয়ত বলা যায়, এতে শিল্পের জাত নষ্ট হল। আবার ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলিও এই ধরনের নাটকগুলির পেছনে আর টাকা ঢালতে চাইছিলো না। সেই কারণে নাট্যকারগণ বাধ্য হলেন সমবেত হয়ে নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করতে। শুরু হল, গোষ্ঠীথিয়েটারের চল। একে একে সৃষ্টি হল বহুরূপী, রূপকার, নান্দীকার প্রভৃতির। এরপর কিছু নাট্যগোষ্ঠীর উদ্ভব হল যেগুলি একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু এর মাঝে এমন কিছু নাট্যকার থেকে গেলেন, যাঁরা না পারলেন কোন 'গোষ্ঠী'র অন্তর্গত হতে, না পারলেন নিজস্ব দল করতে, আবার না পারলেন ফরমায়েশি নাটক লিখতে। এঁরা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেন।

গোষ্ঠীথিয়েটারগুলি কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের মানুষজনদের জন্য নাটক সৃষ্টি করতে পারলেন না। নিজেদের মত করে এরাও তৈরি করল 'দর্শকগোষ্ঠী'। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে জাঁকিয়ে বসল ব্যবসায়িক থিয়েটার। দর্শকদের 'মন রাখা নাটক' পরিবেশন ক'রে মুনাফা অর্জন করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। গণনাট্য নাটকের যে 'চরিত্র' তৈরি করেছিল, তা পরবর্তীকালে সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রক্ষা করা গেল না। যদিও সাম্প্রতিক নাট্য-চর্চার মেধা-মনন-পরিবেশন বিশেষ ভাবে প্রশংসার্হ।

কুশল চ্যাটার্জী : অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ।

লোকসংস্কৃতিতে প্রতিবাদী চেতনা

সম্পাদনা

ড. বসুমিতা তরফদার

বাংলা বিভাগ

পি. এন. দাস কলেজ

Lokasanskritite Pratibadi Chetona

by *Basumita Tarafdar*

Published by *Debarati Mallik*
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 9836733383/9836733393
e-mail : debarati.diyapublication@yahoo.in
Website : www.diyapublication.com

ISBN : 978-93-82094-73-9

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৬

২৫০.০০

শান্তিপুরের লোকসংস্কৃতিতে শোষণ, সংগ্রাম ও প্রতিবাদ
সায়ন চৌধুরী /১২৫
টুসু : বশ্য-প্রতিবাদের নানা স্বর
কুশল চ্যাটার্জী /১৩১
লোকবিশ্বাসে লিঙ্গ ভাবনা : নারী শোষণের এক প্রতিচ্ছবি
শাওনী নন্দ/১৩৫
প্রবাসে প্রান্তিক সমাজের শোষণ, সংগ্রাম ও প্রতিবাদ
নিতা মণ্ডল/১৪১
প্রবাসে গৃহের পরিসর : সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা
শ্রাবণ দাস/১৪৬
সমাজ সংগ্রামে লোকধর্মের ভূমিকা
দীপা চক্রবর্তী/১৪৯
লোকগীতিতে প্রতিবাদ প্রবণতা
সুভদ্রা চৌধুরী/১৫৩
বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতে লোকসংস্কৃতির প্রতিবাদের স্বর
সপ্তর্ষি মাইতি/১৫৬
বাংলার পটশিল্প : শোষণ-সংগ্রাম, প্রতিবাদ
সুপ্রীতি হালদার/১৫৮
বাংলা ছড়ায় শোষণ-সংগ্রাম-প্রতিকার
তাপসী মণ্ডল/১৬২
আদিবাসী লোকশিল্পী : শোষণ-সংগ্রাম,প্রতিবাদ
ঋতুপর্ণা কর/১৬৭
প্রবাসে প্রতিবাদ
আনইনাম মণ্ডল/১৭০
Folk Lores of Bihar : Some Glimpses and Depictions
Sutapa Bhattacharya /176
Folk Songs : The History of Protest and Bob Dylan
Kakoli sen Banerjee /185
Folklore, Economic Exploitation and the Copyright Act
Madhuchhanda Lahiri /191
'Jhumur' through ages : a Protest Narrative
Mrittika Malakar /195
John Henry : Journey from a Folk Legend to a Communist Icon
Suman Ranjan Bandyopadhyay /203

টুসু : বধূ-প্রতিবাদের নানা স্বর

কুশল চ্যাটার্জী

বিষয়বস্তু :- লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকসাহিত্য-সংগীতের এক বিশেষ ধারা টুসু গান। সমাজের নানা ঘটনা সাহিত্য-সংগীতে বারেবারে ঠাঁই পেয়েছে। সমাজে নারীর প্রতি বঞ্চনাও সেই সুর ধরে টুসু গানে উঠে এসেছে। এই লেখায় সমাজ-পরিবারে বধূদের শোষণ-বঞ্চনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতিবাদের সুরের ওপর আলোকপাত করা হল।

কুঞ্জি শব্দ :- প্রতিবাদ, শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, শ্বশুরঘর-পরিবেশ, পরিজন।

॥ ১ ॥

প্রতিবাদ মানুষের চরিত্রের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তবে সব মানুষ সব সময় প্রতিবাদ করেন না। কেউ কেউ প্রতিবাদী হন, তো কেউ কেউ অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে নেন। সবটাই নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির ওপর। কিন্তু মানুষ প্রতিবাদ করে কেন? মূলত : যখন তাঁরা শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত হন। তখন তাঁরা প্রতিবাদ করে ওঠেন। আবার এই প্রতিবাদের চরিত্র মূলত : দ্বিমুখী—

- ক ব্যক্তিগত শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন ও অসন্তুষ্টির জন্যে একক প্রতিবাদ।
- খ. সমষ্টিগত শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন ও অসন্তুষ্টির জন্যে একক বা সমষ্টিগত প্রতিবাদ।

সাহিত্য যেহেতু 'সমাজের দর্পণ' তাই বারেবারে সাহিত্যে শোনা গেছে মানুষের প্রতিবাদী স্বর। ব্যক্তিনাম চিহ্নিত সাহিত্যের পাশাপাশি লোকসাহিত্যেও তা স্পষ্ট। এই লোকসাহিত্য-সঙ্গীতের অন্তর্গত টুসু গানে কীভাবে বিবাহিত নারীর বা বধূ'র প্রতিবাদ উঠে এসেছে, তা এখানে আলোচনা করা হল।

॥ ২ ॥

লোকসংস্কৃতিকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—

১. দৈহিক ক্রীড়াধর্মী (ক্রীড়া, অভিনয় ইত্যাদি)।
২. শিল্পধর্মী (আসবাব, যানবাহন ইত্যাদি)।

(ছড়া, সঙ্গীত, ধাঁধা ইত্যাদি)।

৩. বাক্‌ধর্মী (মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক ইত্যাদি)।

৪. প্রয়োগধর্মী (ধর্ম, লোকাচার, পালা-পার্বণ ইত্যাদি)।

৫. বিশ্বাস-অনুষ্ঠানধর্মী

টুসু উৎসব মূলত : লোক-উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের মাহাত, বাউরি প্রভৃতি সমাজের নারী সম্প্রদায়ের উৎসব মূলত : এটি। আর এই উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত গান, টুসু গান, যার কেন্দ্রে আছেন টুসু। তবু বারেবারে নানা বিচিত্র প্রসঙ্গ টুসু গানে উঁকি দিয়ে গেছে। যার মধ্যে অন্যতম হল বিবাহিত নারী তথা বধূ'র যন্ত্রণা ও অবদমিত তাদের প্রতিবাদ।

॥ ৩॥

কন্যা পিতৃগৃহে জন্মায়, তারপর চন্দ্রকলার মতো তার রূপ-যৌবন-শরীর বাড়তে থাকে। কুল-সম্মান রক্ষার তাগিদে পিতা-মাতা কন্যাকে পাত্রস্থ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতৃগৃহের অনায়াসতা বা সাবলীলতা কন্যা শ্বশুরগৃহে পায় না। যার ভাগ্যে মনোমত শ্বশুরঘর-পরিবেশ-পরিজন জোটে সে হয় ভাগ্যবতী, আর যাদের কপালে তা না জোটে তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে নারী তখন হয়ে ওঠে প্রতিবাদিনী। এমনই কিছু টুসু গানে উঠে এসেছে। এখানে ঐ গানের প্রতিবাদের স্বরূপটি একটু তুলে ধরা যাক—

কুলধর্মরক্ষার্থে পিতা-মাতা অনেক সময় অপাত্রে কন্যা-দানে বাধ্য হন। তাই শ্বশুরবাড়ি অনেক সময়ই কন্যার মতামতে হয় না। কখনও তারা মুখ বুজে তা মেনে নেয়, কখনও আবার প্রতিবাদ করে ওঠে—

"[illegible] বরে দিলা আরো সতীন উপরে।
বল্‌ মা আমি যাই কি করে সতিন উপরে।"

শাশুড়ির কাছে স্নেহের বদলে অধিকাংশ সময় জোটে নির্যাতন। তাই বধূ প্রতিবাদিনী হয়ে ওঠে—

"ই-ডালে পুঁই, উ-ডালে পুঁই, পুঁইয়ে খাব খিচুড়ি।
আর যাব না শ্বশুরবাড়ি, ধাঁইয়ে মারে শাশুড়ি।।"

অর্থাৎ, শ্বশুরবাড়ির তুচ্ছাতিতুচ্ছ হবার ওপরেও বধূ'র কোন অধিকার নেই। শ্বশুরবাড়িতে সামান্য সাধ-আহ্লাদও বধূ'র পূর্ণ হয় না। আবার সে প্রতিবাদিনী হয়ে ওঠে—

"এ বছরে পৌষ-পরবে সবাই পরে নীল শাড়ি।
আমার শাশুড়ি দুনিয়ার পাপী নাই দিল গো নীল শাড়ি।।"

তবু সব সহ্য করা যেত যদি স্বামী মনোমত হত। কিন্তু সে তো একে বুড়ো, তায় আবার মাতাল। বধূ তাই অসহ্য হয়ে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—

"সাঁঝ সকালে দেখে আসে জ্বর।
স্বামী বললেই যায় উঠার ঘর।
শীত সকালে মদ খাইতে হয়, খাওয়াবার নাই শক্তি বল।
সন্ধ্যা হইলেই মদ খাইতে যায় হাত বাড়াইয়া টলমল।।"

শুধু তাই নয়, বুড়ো বর হওয়ায় বধূ'র যৌবনও থাকে উপবাসী। বাহির-ভিতরে বঞ্চিতা বধূ নিজের প্রতি বঞ্চনায় প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—

"বইসতে নারে উইঠতে নারে চলে যে লাঠি ধইরে
সাঁতার দিতে পারে না যে আমার যৌবন সাগরে
এমন বুড়ার বয়স মাগো আশি বছরের উপরে
...খায়ে শুলে নাক ডাকে ঘড় ঘড় কইরে"

স্বামীর বধূ প্রতারিতা। তাই প্রতিবাদিনী হয়ে স্বামীকে সে অভিযুক্ত করেছে—

"দুই বেলা যে খেতে না পাই
কারই কাছে বলিনা
ভাতের অভাব না করো হে
বিয়া করা চলে না।
আগে তুমি বলেছিলে
অভাব কিছু হবে না
এতদিনে বুঝেছি হে
পেটভরা নাই খাওনা।"

শুধু তাই নয়, তার ওপর আছে স-পত্নী যন্ত্রণা। আছে ননদিনী-সমস্যা। বধূকে তাই বলতে শুনি—

"সাত ননদে ঝগড়া করে শ্বশুরে ঠাকা মাইরে।
মইলুম রে গরল খাইয়ে লাইগেছে দুখ পাঁজরে।"

আর সতীন-যন্ত্রণায় বধূ এতটাই তিতিবিরক্ত যে সে হিংসার পথ অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না। তাই কখনও সে বলে—

"এক গাড়ি কাঠ দুগাড়ি কাঠ
কাঠে আগুন লাগাব
যখন আগুন ধুধুলাবে
সতীনটাকে ঠেলে দিব।"

আবার কখনও বলে—

"আসল সতীন কইসুল সতীন
খাঁস সতীন পান্তাভাত
অন্য ঘরে শুয়াই রইবে
খাই বিষ মরিবাত।"

আর সতীন-অভিজ্ঞতায় বধূ এতটাই ত্রস্ত যে স্বয়ং টুসুকেও সাবধান করতে ভোলে না—

"উপরে যাইওনা টুসু
উপরেতে সতীন আছে
জল দিলে জল খাইওনা
পানেতে ধুতুর আছে
আর যা বলিতে পারে না।"

॥ ৪ ॥

আসলে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, সতীন থেকে বধূ নির্যাতন হয়ে শ্বশুরবাড়িতে যে যাতনা সহ্য ক'রে এসেছে, তার থেকে তার মনে জন্মনিয়েছে হতাশা-ভীতি-বিষণ্ণতা। তাই তো বধূ বলতে পারে—

"আমার কাজ নাই গ শ্বশুরঘরের সুখে
কিছু খাইব্যে নাই যাব আর ই নরকে"

আর দীর্ঘ দিনের শোষণ-বঞ্চনায় সে হয়ে ওঠে প্রতিবাদিনী। তার প্রতিবাদ কখনও পিতা-মাতা'র অবিবেচনার প্রতি, কখনওবা শ্বশুরবাড়ির সদস্য-সদস্যাদের প্রতি। আবার বাটিকেও সে বলতে ছাড়ে না—

"ওরে কালা কিনি টাকা
কিনি যে ঘুরা মরে।
ঘুরার সঙ্গে মিলাতে নারি
কইলকাতার শহরে
কইলকাতারই লোকে বলে
ইটি তুমার কে বটে?
লাজ শরমে বইলতে হয়
(ইটি) ঠাকুরদাদার ভাই বটে।"

বাস্তব-জীবনে বধূ প্রতিবাদ পারত কি না সেটা প্রশ্নের বিষয়, কিন্তু টুসু গানে বধূর প্রতিবাদ অবশ্যই তাকে মানসিক শান্তি দিয়েছিলো। কিন্তু যে সমাজে সমাজের চাপে পিতাকে হৃদয়ের ধন কন্যাকে বুড় বরেও পাত্রস্থ করতে বাধ্য হতে হয়, সেই সমাজেও যে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার পর বধূ শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাধীনতাকে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, তার ইঙ্গিত টুসু গানের গীতিকার দিয়ে গেলেন। সেই নাম না জানা টুসু গানের গীতিকারের সৃষ্ট বধূ তাই বলে—

"এক সতীন সইলাম দু সতীন সইলাম
তিন সতীন সইব না
সাক্ষী থাক হাঁ দেওর
তর ভাইয়ের ঘর কইরব না।"

আর আছে বধূ নির্যাতনের পর শাশুড়ী মায়ের অভিশাপও—

"অ-ন সতীন মারবি না কি
তর কি আমি সতীন বটে
পাটির তলে ছুরি গাইড়ে
তোকে বলি কইরব।।"

আর এখানেই বিষয়টি অন্য উচ্চতা লাভ করে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

পাঠ ও প্রতিক্রিয়া

সম্পাদনা

রবিন পাল
দীপঙ্কর মল্লিক

Hansuli Banker Upakatha

Path O Protikriya

by *Rabin Pal & Dipankar Mallik*

Published by *Debarati Mallik*
Diya Publication, 44-1/A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone - 9836733383/ 9836733393
e-mail : diyapublication@gmail.com
Website : www.diyapublication.com

ISBN : 978-93-82094-08-1

প্রথম প্রকাশ

শারদ উৎসব ২০১৭

মূল্য : ১৫০

'অহং'-এর আড়ালে অন্তর্যামী ▶ ১৫১
পিয়ালী খাঁ

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : রাঢ়ের আঞ্চলিক জীবন ▶ ১৫৪
সুভাষ মিত্র

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : অপ্রধান চরিত্র ▶ ১৬৪
কুশল চ্যাটার্জী

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র নদী ▶ ১৭০
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : পরাজিত নায়কের মা, নায়কের পরাজয়ের আখ্যান ▶ ১৭৯
আকাশ বিশ্বাস

দ্বিতীয় পর্ব :

পাঠকের চোখে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ▶ ১৮৭-২৫৮
দীপঙ্কর মল্লিক

১. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি ১৮৯
২. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : সেকাল ও একালের দ্বন্দ্ব ২০১
৩. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : মিথ ও রিয়ালিটির দ্বন্দ্ব ২০৬
৪. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : পাখি চরিত্র ২১১
৫. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : সংগীত প্রয়োগের সার্থকতা ২১৫
৬. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : হাঁসুলী নদীর ভূমিকা ২১৯
৭. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : সুচাঁদ চরিত্র ২২৪
৮. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : মহাকাব্যিক উপন্যাস ২২৯
৯. গোপালীবালা : সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ২৩৬
১০. কালোশশী : নারী ও নাগিনী ২৪০
১১. সুবাসী : বৈরিণী নারী ২৪৪
১২. বসন্ত : 'চিরকালের ভালো মানুষ' ২৪৭
১৩. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : বনওয়ারী চরিত্র ২৫০
১৪. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : করালী চরিত্র ২৫৫

তৃতীয় পর্ব :

স্মরণীয় উদ্ধৃতি : বিচার-বিশ্লেষণ ▶ ২৫৯-২৭২
দেবাহুতি মল্লিক

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : অপ্রধান চরিত্র

কুশল চ্যাটার্জী

ট্রাজেডিতে চরিত্র-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বলা যায়, শুধু ট্রাজেডিতেই নয়, সাহিত্যের যে কোন ধারায় চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাহিত্যে আমরা বহু ধরনের চরিত্র পাই। গুরুত্ব অনুসারে তাদের শ্রেণিবিভাগ এইভাবে করা যায়—

যে সব চরিত্র সাহিত্যের কেন্দ্রে থেকে মূল ঘটনা প্রবাহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাকে বা তাদেরকে বলা হয় মুখ্য চরিত্র। পাশাপাশি মুখ্য চরিত্রগুলি যে সব চরিত্রগুলির দ্বারা বিকশিত ও রঞ্জিত হয় সেই সব চরিত্রগুলিকে বলা যায় গৌণ চরিত্র। গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে কিছু চরিত্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে, তাদের প্রধান গৌণ চরিত্র বলা যায়। আবার কিছু চরিত্রের স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা সাহিত্যে থাকে না। তাদের বলা যায় অপ্রধান গৌণ চরিত্র।

॥ ২ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে প্রচুর অপ্রধান চরিত্র সৃজন করেছেন। উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা রক্ষার্থে তার প্রয়োজন ছিল। এরা হলেন—১. নিমতেলে পানু, ২. নটবর, ৩. নীলত্রের মা, ৪. কত্তাবাবা(কল্পিত), ৫. পানার বৌ, ৬. গোপালীবালা, ৭.গোরাচাঁদ, ৮.পরম, ৯. কালোশশী, ১০. প্রহ্লাদ, ১১. রতন, ১২. মাইতো ঘোষ, ১৩. যামিনী, ১৪. নটবর, ১৫. নসু, ১৬. মাখন,১৭. ঘোষবউ, ১৮. রমণ, ১৯. নয়ান, ২০. সুবাসী, ২১. হেদো মণ্ডল, ২২. পুণী, ২৩. নয়ানের মা, ২৪.পানু, ২৫. পাগল ইত্যাদি। উপন্যাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় কিছু চরিত্রের

প্রসঙ্গ উপন্যাসে আছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, কিছু চরিত্র নিছক-ই এসেছে উপন্যাসে। কিন্তু এমন কিছু চরিত্র আছে যেগুলি মুখ্য বা প্রধান চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অন্তত গৌণ চরিত্র বলা যায় না। যেমন—পাখি, সুচাঁদ। এই আলোচনায় এদের অপ্রধান চরিত্রের গোত্রে ফেলা হল না।

❖ নিমতেলে পানু

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে খল চরিত্র হিসাবে অবস্থান করছে পানু। সে ধূর্ত, স্বার্থপর, কলহপ্রিয়। তার শয়তানি মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের প্রথম অংশ থেকে শুরু করে গোটা উপন্যাসে তার অবাধ বিচরণ। তার অপকর্মের নিদর্শন এরকম—

১. বনওয়ারী-কালোশশীর নিশি-সাক্ষাতের কথা সেই সকলের কাছে প্রকাশ করেছে।
২. মনিবের আলু চুরি করার মতলব করেছে।
৩. নয়ানের বাঁশ ঝাড় নিজের নামে বিক্রি করেছে।

অসাধারণ হিসেবি পানু। পুজোর খরচের হিসেব রাখার ভার পানুর উপর— 'বনওয়ারী খরচ করেছে, পানু মনে করে হিসেব রাখছে। এসবে নিমতেলে ছোকরা খুব নায়েক।' 'লোকের অনিষ্ট হলেও সে খুশি হয়। বৃষ্টিতে হেঁদো মণ্ডলের গুড় নষ্ট হলে সে আনন্দ পায় পানু দূরে—রসটা জমিয়ে তুলেছে—হেঁদো মণ্ডলের গুড়টা নষ্ট হওয়ার আনন্দ অনুভব করে।' কূটনীতিতেও সে পারদর্শী। কালোশশী, বনওয়ারীর কথা সে সবটা প্রকাশ না করে একগোষ্ঠীয়দের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রকাশ করেনি, কারণ 'ওটাকে নিজস্ব করে রাখলে ভাঙিয়ে কিছু কিছু আদায় করতে পারবে মাতব্বরের কাছে।' বাইরে বনওয়ারীর অনুগত কিন্তু আড়ালে সে বনওয়ারীকে তোয়াক্কা করে না। মাতব্বর সম্বন্ধে হীন মন্তব্য করতেও বা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে ছাড়ে না।

ক) 'মাতব্বর যদি শাসন করতে 'অন্যায়' করে, তবে দুষ্ট লোকে 'অন্যায়' করলে তার শাসন হবে কি করে?' (প্রসঙ্গ: করালীকে প্রশ্রয়—বনওয়ারীর)

খ) 'ঘুঘু শালো তকে তকে পরের দুয়ারে, উদিকে শালোর ঘরে কুত্তা ঢুকে—' (প্রসঙ্গ: জমির জন্য পরমের চন্দনপুরের বাবুদের পেছনে ঘোরা)

তবে দুর্বল প্রাণতন্ত্র। করালীর বিরুদ্ধাচরণে সে তার কাছে মার-ও খেয়েছে। বনওয়ারীর নামে ভুলো প্রচারে সে বনওয়ারীর শাসনও সহ্য করেছে।

উপন্যাসের নিরিখে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য—

১. উপন্যাসে সে খলনায়ক।
২. কাহার পাড়ার নিস্তরঙ্গ জন-জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা প্রবাহের সাথে সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। যেমন— ক. 'ঘুঁড়ো শীষ' প্রসঙ্গ, খ. বনওয়ারী কালোশশী গোপন সাক্ষাতের প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

ঙ কালোশশী ও গোপালীবালা

বনওয়ারীর জীবনে বহু নারীর আগমন ঘটেছে প্রণয়সূত্র ও বৈবাহিক সূত্র ধরে। তার মধ্যে এই দুই জনেই প্রধান। প্রথমজন তার কাঁচা বয়সের প্রেমিকা। তবে সে যে রং বনওয়ারীর মনে লাগিয়েছিল পরিণত বয়সে এসেও সে রং একটুকু ফিকে হয়নি, লজ্জা ও পবিত্র জ্ঞানের চাদরে বনওয়ারী তা ঢেকে দিয়েছিল মাত্র। আর দ্বিতীয়জন বনওয়ারীর (প্রথমা) স্ত্রী। কালোশশীর মধ্যে যেমন স্ত্রী সত্তা (পরমের ঘরনি হয়েও) সেভাবে ফুটে ওঠেনি; গোপালীর মধ্যেও তেমনি প্রেমিকা সত্তা সে রকম দেখা যায়নি।

গোপালী চরিত্রটি মূলত একমুখী। সে হাঁসুলী বাঁকের নিস্তরঙ্গ পুকুরের জল—শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি। মুখ বুজে বনওয়ারীর ঘর করবার মধ্যেই সে পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে। কালোশশী ও বনওয়ারীর সম্পর্ক নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে বনওয়ারীর দ্বিতীয় বিবাহ সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি—'বনওয়ারীর প্রথম স্ত্রী গোপালীবালা কেঁদেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল' যদিও 'কাহার পাড়ায় স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে যায়—অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতিনের সঙ্গে কাহার মেয়েরা ঘর করে না।' তবু গোপালী বনওয়ারীর ঘর যেমন ছাড়েনি, তেমনই সতিনের সাথে সংসারও করেছে। পাগলের বিয়ের প্রস্তাবও সে অস্বীকার করেছিল। তবে গোপালী সরল, সাদাসিধে মানুষ। তাই বনওয়ারীর 'এক কুড়ি' টাকার ঘুষ ও দুটি সোনার কানফুল গড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ভুলে গিয়েছিল।

কালোশশীর চরিত্রের কিছু বহুমুখ। যেমন—

- সাধারণ কাহারনি : 'মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে এসে কালোশশী কাঁদছিল। পরম তাকে বেশ ঘা কতক দিয়েছে।'
- প্রেমিকা নারী : 'বাতাস নয়, ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিলে কালোশশী। ব্যাকুলভাবে সে বনওয়ারীর খালি হাতখানি জড়িয়ে ধরলে।'
- প্রতিবাদী/প্রতিশোধী নারী : কালোবউকে বিয়ে করে পরম ভালোবাসলে তিনজাতের কন্যাকে,—কালোবউ মনের আক্রোশে চন্দনপুরে রোজ খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।'
- সন্তানহীনা নারী:- 'কী হবে বেঁচে? ছেলে নাই? পুতে নাই? সোয়ামী, সে কসাই—'

চ পরম

পরম আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর, কালোশশীর স্বামী। কালোশশীর কথা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে— 'মাতব্বর যদি মাতব্বরের মতো হয় তো পরম জমা জানে। ...সে হল— 'পরম' আটপৌরে। 'আজদিন' নিজের ভাবনা, ঘর-দুয়ার আর এই পয়লা-জমি।'

পরম উপন্যাসে কিছুটা anty-hero-র ভূমিকা নিয়েছে। বনওয়ারীর সাথে বারে বারে লড়াই-এ জড়িয়ে পড়েছে। আবার পুরাতনের করালীকে বিপদে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছে।

❖ পাগল

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পাগলের আবির্ভাব। সে বিপত্নীক। একমাত্র মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ নাতনীকে সে খুব ভালোবাসে। উপন্যাসের মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়ে উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যন্ত সে ছিল। বনওয়ারীর সে বন্ধু। পাগল অনেক পরে উপন্যাসে পদার্পণ করলেও কাহারদের সাথে একেবারে মিলেমিশে গেছে। সে অন্যান্যদের সঙ্গে ধান হাওয়ার কাজ করেছে, আবার বিয়ে বাড়ির পালকিও বয়েছে।

বনওয়ারীর বন্ধু পাগল। করালী বনওয়ারী প্রতিদ্বন্দ্বী। তবু পাগল করালীর সত্যবাদের সমর্থন করেছে। বনওয়ারীর সামনেই বলেছে,

'জাত যার যায়, তার যায়—এমনিতেই যায়। যার যায় না, তার যায় না। জাত না দিলে, নেয় কে ...লাখ কথার এক কথা বলেছে করালী।'[illegible]

উপন্যাসের 'শেষ পর্বটি শুরু হয়েছে দুই মাস পর, তখন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শেষ হয়ে গিয়েছে।'[illegible]

বনওয়ারী এখন শয্যাগত। তখনও পাগল তার পাশে ছিল। পরিবর্তিত তথা নব হাঁসুলী বাঁকের পরিবর্তনের কথা পাগলের সাথে সাথে পাঠকও জানতে পারে—

ক) 'দুঃখের ঠিকেদারেরা আমার বাঁশ কিনেছে ভাই, ...সেই (করালী) ভাই, সে মস্ত ছিল বাঁশবাদির বাঁশের।'[illegible]

খ) 'বাবার থানকে কেটেকুটে সমান ক'রে মটর গাড়ির আস্তানা করছে বনওয়ারী ভাই।'[illegible]

পাগল চরিত্রটি আরও একটি কারণে তাৎপর্যময়। সে ছড়া কেটেছে, গান গেয়েছে যা লোকসাহিত্যের উপাদান। গীতগান—

১. 'শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে—
বাঁশ দিব সই কালীদহে..' (নন্দুর গানের উত্তর-স্বরূপ)

২. 'ও সায়েব আজব দেখালে।
হায় কলিকালে!' (ইংরেজদের রেললাইন পাতা)

৩. 'প্রেমে পাগল হলাম আমি, প্রেমের দেশা ঘুচিল না—
হায় সখি গো—মনমে হ'ল ফিঙের ফুল কই ফুটিল না!'— ইত্যাদি।

আর কাটা ছড়া—

ক) 'হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—বাই বলিহারি,
বাঁধিল নতুন ঘর নতুন সুন্দরি' (বনওয়ারীর দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গ)

ঘ) 'অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে।
অন্ধকারেই পরানপাখি সেই দেশেতে যায় রে।' (নয়ানের মৃত্যু প্রসঙ্গ)

বাদ প্রবাদ:

'ডাক নইলে ভিখ মেলে না।'

❁ নয়ান

নয়ান পাখির প্রথম স্বামী। কিন্তু অসুস্থ হাঁপানি রোগী নয়ানকে ছেড়ে পাখি করালীর কাছে চলে গেছে। নয়ান ভাগ্যবিড়ম্বিত। পারিবারিক প্রাচুর্য এক সময় থাকলেও তা সে হারিয়েছে, হারিয়েছে স্ত্রী পাখিকে। দুর্বল শরীরে দুরন্ত পাখিকে সে ধরে রাখতে পারে নি। তাই বারবার বিচার চেয়েছে সে কখনও সমাজে বনওয়ারীর কাছে, কখনও নীরবে কল্পনার কাছে। 'মাতব্বর' বনওয়ারী করালীর সাথে স্ত্রী পাখির বিয়ে দিয়ে দিলে নয়ান সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে—

> নয়ান চুপ করে বসে আছে নিজের দাওয়ায়। বুকটা 'ধুঁকছে', পাঁজরগুলো উঠছে, নামছে, কালো অন্ধকারের ফোকড়ানো বুকের মধ্যে সাদা চোখ দুটো হাঁসুলী বাঁকের মাথায় জঙ্গলের বাঁশের দিকে চেয়ে রয়েছে—স্থির নিষ্পলক হয়ে। সে মনে মনে বাবাকে ডাকছে।

সে করালীর কাছে পরাস্ত হয়েছে। করালীর সাথে সমান লড়াই দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তাই সে নিষ্ফল আক্রোশে কখনো পাখির নাকে কামড়ে দেয়। কখনও করালীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর ভেঙে দেয়। তবে তার মৃত্যু সত্যিই মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

❁ নসুবালা

করালীর পিসতুতো ভাই নসু। আসল নাম তার নসু রায়। সে মেয়েদের মতো পোশাক পরে, মেয়েদের মতো সাজগোজ করে। কথাবার্তায় ধরনও মেয়েলি। তাই করালীর প্রতি তার অপার ভালোবাসা। সকল কাজে সকল সময় করালী পাশে পেয়েছে নসুকে। সে করালীর জন্যে কলহও করেছে—

ক. প্রেক্ষাপট—পুজো : 'হঠাৎ ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালো করালী। তার হাতে তিনটি হাঁস। পিছনে নসুবালা আর পাখি।'

খ. প্রেক্ষাপট—করালীর কাহার পাড়া ত্যাগ : 'ওদিকে করালী পাখিকে নিয়ে তখন বেরিয়ে পড়েছে বাঁশবাঁদি থেকে। ...নসু-দিদিও চলল।'

গ. প্রেক্ষাপট—করালীর নয়ানকে প্রহার প্রসঙ্গে বনওয়ারীর সাথে কথোপকথন: 'মেরে ফেলাবে না কেন, শুনি? তোমার পরিজনের লোক যদি কামুড়ে ধরে নাক কেটে দিয়ে যায়, তবে তুমি তাকে মেরে ফেলাবে না। ছেড়ে দেবা?

নসুবালা চরিত্রটি আর একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের 'শেষ পর্ব'-এ যখন কেউ নেই, তখন অসুস্থ বনওয়ারীর পাশে পাগলের সাথে সে ছিল। নানা খবর সে বনওয়ারীকে দিয়েছে, দিয়েছে সান্ত্বনা। আসলে—'তার এই নিগুণির জন্যেই কি

বাবাঠাকুর দয়া করে নসুকে নারীর স্বভাব দিয়ে গড়েছিলেন? গ'ড়ে বলেছিলেন—'যদি যখন চ'লে যাব হাঁসুলী বাঁক ছেড়ে, বনওয়ারী যখন কুটোর মতন বুড়ো লোক হবে, তখন তার ভার নেবার জন্যেই তোকে গড়লাম?'[১৯]

নসু করালীকে ভালোবাসলেও তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নি। উপন্যাসের 'শেষপর্ব'-এ সে যখন কাহার পাড়ার লোকেদের পরিণতি শোনাচ্ছে বনওয়ারীকে, সেই সময় বলে—

> 'বাবাবাবা, 'ওই' মুখপোড়া করালীর উপর তোমার লজ্জা নাই নাই। অত ভালবাসতাম তাকে, তব কি হয়েছে তার উপর। ছি-ছি-ছি!'[২০]

আর উপন্যাসের শেষে 'কাহার' করালীর শিবড় সম্বন্ধে খবরও সেই শুনিয়েছে—

> দেখে এলাম, বাঁশবাঁদির বাঁকের দেড় গাদি ভেঙে বাঁশের শোঁড়া বেরিয়েছে। আর কী কচি কচি ঘাস। আর দেখে এলাম সেই ছকবুড়োকে। ...বালি খুঁড়তে আর কি খুঁড়ছে—।[২১]

◆ নয়ানের মা

নয়ানের মা, নয়ানের মতোই দুর্ভাগিনী। প্রাচুর্যের শীর্ষ থেকে দুঃখের আশ্রয়-শাখায় ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী সে। নিজের চোখে পুত্রের ঘর ভেঙে যাওয়া সে দেখেছে, দেখেছে পুত্রের মৃত্যু। বনওয়ারীর যৌবনকালে সেও ছিল তার প্রেয়সী। কিন্তু ভাগ্য-ভগবানের সাথে বনওয়ারীও তার এবং তার পুত্রের ওপর অবিচার করলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সে দুঃখিনী, কাহার পাড়ার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী।

◆ কত্তাবাবা

ঘটনা পরম্পরায় কাহারপাড়ার কল্পিত কত্তাবাবা (ব্রহ্মদৈত্য)-ও যেন জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছেন। সুচাঁদের বর্ণনায় যাঁর 'এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম।' বারে বারে কাহারদের কথায়, স্বপ্নে তিনি এসেছেন। তাঁর পুজোও হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা—তাঁর সাথে সাথে তাঁর (কল্পিত) বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটিও কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর বাসস্থান বেল গাছটি, যেটি ছিল স্থবির চিরাচরিত রীতি-নীতির বা পুরাতন ভাবনা-চিন্তার রূপক স্বরূপ, তাও 'আধুনিকতা'র ঝড়ে উপড়ে গিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সমাপ্তির সূচনা করেছে।

॥ ৩ ॥

উপরোক্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও আরও কিছু পার্শ্বচরিত্র 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আছে, যেগুলি খুব একটা স্বতন্ত্র গুরুত্বের দাবি রাখে না।

নটবরের মা, পানার বৌ, সাবেক কাহার বধূর পরিচয় দিয়েছে। পাশাপাশি ঘোষবউ-এর কথা-বার্তায় দেখা যায় তুলনামূলক পোলিশনেস্। আবার প্রহ্লাদ, রতন, গুপী যেখানে বনওয়ারী পন্থী সেখানে মাথলা, নটবরেরা অনুসরণ করে করালীকে। রতিরা

যেন উপন্যাসে ধনবাদী সমাজের প্রতিনিধি, 'চন্দনপুরের পয়সা' তার নিত্যসঙ্গী। তেমনি, নীচু মণ্ডল উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। নিজেদের কুলদেবের সঙ্গে তার ঔদ্ধত্যসুলভ আচরণ বিস্ময়কর। সুচাঁদ ও সাধারণ কাহারনি বনওয়ারীর বয়স ও সামাজিক অবস্থান তার চাহিদাকে তুষ্ট করতে পারেনি। তাই সে অন্যান্য কুলত্যাগী বা ঘরত্যাগী কাহারনির মতোই করালীর কাছে গেছে। সিধু, কালশশী ঘরত্যাগী নারীদের করুণ পরিণতির প্রতীক। তবে সবার থেকে আলাদা কাহার-নারী বসন। পাখির সে যোগ্য মা। কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে সে যেন কাহার পাড়ার ভিন্নদেশী। তার কথাগুলি লক্ষ করলে দেখা যায়, সেগুলিতে নাগরিকতার ছোঁয়া যেন কোথায় লেগে আছে।

যেমন—'হাঁ গো, টাকা কতগুলি আছে বলদিনি।'

সবদিক থেকে বসন কাহার পাড়ার সকলের থেকে স্বতন্ত্র—

> বসন—পাখির মা চিরকালের ভালোমানুষ। আর চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে প্রেমের কথা তো সবাই জানে। কাহার পাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত। ওই চৌধুরীর ছেলেকে সে যে ভালোবেসেছিল, তারপর সে আর কারও দিকে ফিরে তাকায় নাই। চৌধুরীদের ছেলের মৃত্যুর পর সে থাকত সৎ জাতের গৃহস্থ ঘরের বিধবার মতো। শান্ত মৃদুভাষী বসন্ত মেয়ের মৃত্যুর পর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওই ভাঙা চৌধুরী-বাড়িতে। সেই খানেই এঁটোকাঁটার প্রসাদ খায়, আর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে।[১৪]

তথ্যসূত্র।

১। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা': তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ আষাঢ়, ২০০৮। পৃষ্ঠা-৫০
২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৭
৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬
৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০
৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫
৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২২
৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২২
৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫
৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫
১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১
১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫
১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২
১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৩
১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮

১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০০
১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০২
১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮
১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯৯
১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৫
২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১২
২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭

চতুর্থ বছর। চতুর্দশ সংখ্যা।

কিংশুক

হেতুচর্চাই প্রজ্ঞাচর্চার পন্থানির্দেশ

সাহিত্য বাক্সবন্দী

চর্চারস্তু

ISSN 2394 5877

9 772394 587351

সূচিপত্র

এখন যা ভাবছি

কথোপকথন

এক ❑ যশোধরা রায়চৌধুরী

দুটি অণু রহস্য গল্প

এক : সিরিয়াল এবং দুই : স্মৃতি ❑ যশোধরা রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ কথা

করবিজ্ঞান : একটি আলোচনা ❑ ঋতা হাজরা গোস্বামী

বাংলা রহস্য কাহিনীর ইতিহাস পরম্পরার বিভিন্ন আঙ্গিক ❑ সুগত চক্রবর্তী

সীমাপারের যোগাযোগ

কথোপকথন

দুই ❑ পাবলো শাহি

বৃষ্টিভেজা জামরুল গাছ সিরিজের ০৬টি কবিতা ❑ পাবলো শাহি

বিষয় : লোকসংস্কৃতি

নবান্ন উৎসব : এক প্রাচীন শিকড়ের অনুভব ❑ অর্পিতা মণ্ডল

কথোপকথন

তিন ❑ রম্যাণী গোস্বামী

ভৌতিক গল্প

গরম ভাতের গন্ধ ❑ রম্যাণী গোস্বামী

বিষয় : পর্যটন

সাঁওতাল পল্লীতে ❑ ধরিত্রী গোস্বামী

কথোপকথন

চার ❑ সুশীল মণ্ডল

গুচ্ছ কবিতা ❑ সুশীল মণ্ডল

বিষয় : বহুমুখী

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'য় ঐশ্বরিক ভাবাবেগে লৌকিক আবেশ ❑ সুশান্ত মণ্ডল

'দীপ্ত আলোর শিখা' : সুফিয়া কামাল ❑ নাফিসা আফরা

'এ কোন বন্দিনী নারী : নারায়ণ সান্যাল এর দৃষ্টিতে' ❑ ঐন্দ্রিলা দে

চৈতন্যযুগের তিন নারী : লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও জাহ্নবা ❑ কুশল চ্যাটার্জী

বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ : অবহিতের আশ্বাস কাটে পরম আশ্রয় ❑ সৌমেন রক্ষিত

কাশীদাসী মহাভারত সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গ : অভিনব হরি-হর মাহাত্ম্য ❑ সৌমিতা মুখার্জী

চৈতন্যযুগের তিন নারী : লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও জাহ্নবা

কুণাল চ্যাটার্জী

সংক্ষেপ: চৈতন্যযুগের তিনজন উল্লেখযোগ্য নারী হলেন লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও মাতা জাহ্নবা। প্রথম দুইজন নিমাই বা শ্রীচৈতন্যের গৃহিণী ও তৃতীয়জন মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পার্ষদ নিতাই তথা নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, পারিবারিক বা সাংগঠনিকতার মানদণ্ডে এই তিন নারীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্তমান। মূলত: এই প্রবন্ধে এঁদের মধ্যে উপরোক্ত মানদণ্ডগুলির কয়েকটির ওপর ভিত্তি ক'রে তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দ :- সামাজিক পরিচয়, আধ্যাত্মিক পরিচয়, সাংগঠনিক ভূমিকা।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপুরুষ যদি হন শ্রীচৈতন্যদেব, তবে প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন এর আবরণ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর (মোটামুটি) ২৪ বছরের গৃহ জীবনে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পেয়েছিলেন সহধর্মিনী রূপে। প্রথমজন ছিলেন তাঁর প্রথমা পত্নী, দ্বিতীয়জন ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী। আর মাতা জাহ্নবা ছিলেন নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী। এই তিন নারীর মধ্যে তুলনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এই জন্যে যে, এঁরা তিনজনেই প্রায় সমসাময়িক ও তিনজনের মধ্যেই একটি যোগসূত্র বর্তমান, আর তিনি হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব।

সামাজিক পরিচয়ে দেখি, বল্লভাচার্যের কন্যা ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। ১৫০১ অথবা ১৫০২ সালের কোন একটি সময়ে নিমাই-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। পাশাপাশি সনাতন মিশ্র ও মহামায়াদেবী'র কন্যা ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। অনুমানিক ১৫০৬ মতান্তরে ১৫০৭ সালে নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া'র বিবাহ সম্পন্ন হয় লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী'র দেহান্তরের পর। আর ১৪৩১ শকাব্দে সূর্যদাস সরখেলের ঘরে জন্মান জাহ্নবা মাতা। ১৫২০ সালে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বিবাহ করেন। অর্থাৎ, প্রথম দু'জন ছিলেন বিবাহ-পরিচয়ে নিমাই তথা মহাপ্রভু'র গৃহিণী, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন বিবাহ-পরিচয়ে নিত্যানন্দের পত্নী।

১

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। উভয়ের নামের সাথে 'প্রিয়া' অংশটি অত্যন্ত মাধুর্য বহন করেছে।

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও জাহ্নবা মাতা – তিনজনেই সামাজিক পরিচয়ের সাথে ছিল আধ্যাত্মিক পরিচয়। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী'র আধ্যাত্মিক পরিচয় পাই এইভাবে-

'পূর্বেতে শ্রীরাম জায়া জনক নন্দিনী।
অবতীর্ণ হেল ভবে প্রয়োজন জানি।।

শ্রীকৃষ্ণ রমণী পূর্বে শ্রীরুক্মিণী নাম।
গৌর প্রেম সেবা লাগি হৈল বিদ্যমান।।
কলির প্রারম্ভে গৌর সহিত বিলাস।
অন্তরে জানিয়া দোঁহে হইল প্রকাশ।।
জানকী রুক্মিণী দোঁহে একত্র মিলন।
লক্ষ্মীরূপ পরিগ্রাহী দিল দরশন।।"১

পাশাপাশি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র আধ্যাত্মিক পরিচয়ে দেখি – ঐশ্বর্য পুরুষোত্তম নারায়ণের 'শ্রী', 'ভূ' ও 'নীলা' বা 'লীলা' নামক যে তিনটি শক্তি আছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছিলেন এই ভূশক্তিরূপিণী। আবার জাহ্নবা মাতাকে বলরামের স্ত্রী রেবতী'র মানবী অবতার রূপে দেখা হয়।

সামাজিক পরিচয়ে তিনজন নারীই বৈষ্ণব জগতের দুই দিকপাল পুরুষ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু'র গৃহীজীবনের সহধর্মিণী ছিলেন। পারিবারিক জীবনের এই গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়ে তিনজনেই ছিলেন ভূষিতা।

পারিবারিক দায়-দায়িত্ব তিনজনেই পালন ক'রে গেছেন নিপুণভাবে। তিনজনেই ছিলেন গৃহকর্মনিপুণা। আসলে – "সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন লক্ষ্মীপ্রিয়া, প্রত্যুষে উঠে গৃহ-মার্জনা, দেবসেবা, তুলসী সেবা, রান্নার দায়িত্ব ছিল তাঁর।"২

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও ছিলেন সংসারমুখী। বিবাহিত জীবনে শাশুড়ী-মাতার সেবা, গৃহের কাজ তিনি হৃষ্ট চিত্তেই ক'রতেন। নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহ-ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার পরও তিনি সে সকল কর্ম ক'রে গেছিলেন। আবার জাহ্নবা মাতার ক্ষেত্রেও এই গুণটি দেখা যায়। শুধু সংসার দেখা নয়, সহোদরা বসুধাদেবী'র সন্তানদেরও (গঙ্গামণিদেবী ও বীরচন্দ্র প্রভু) লালন-পালন করেন তিনি।

আর একটি বিষয় আলাদাভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। এই তিনজন নারীই ছিলেন সন্তানহীন। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কেউই সন্তান-ধারণ করেন নি। সন্তান-ধারণ করেন নি জাহ্নবা মাতাও। তবে বসুধা মাতার সন্তান বীরচন্দ্র প্রভু ও গঙ্গামণি দেবীকে তিনি সন্তান- স্নেহে পালন করেন।

২

এবার তিন তিন নারীকে একটু অন্যভাবে দেখা যাক —

বিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ছিলেন নিমাই-এর নিজের পছন্দের পাত্রী। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে পাই —

"একদিন বল্লভাচার্য কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে এলা করি গঙ্গাস্নান।।

তারে দেখি প্রভু হৈলা সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মীচিত্তে প্রীত পাই প্রভুর দর্শন।।
সাহজিক প্রীতি দোঁহা করিল উদয়।
বাল্য ভাবাচ্ছন্ন তবু হৈল নিশ্চয়।।
দুঁহা দেখি দুঁহা চিত্তে হইল উল্লাস।
দেব পূজা ছলে কৈল দোঁহে দোঁহে পরকাশ।।"৭

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছিলেন শচীদেবীর নির্বাচিতা। পছন্দের ও প্রাণাধিক প্রিয় পত্নী (লক্ষ্মীপ্রিয়া)-র অকাল প্রয়াণের পর নিমাই-এর কাছে সংসার বন্ধন নিরস হয়ে উঠেছে, তখন পুত্রকে পুনর্বার সংসারমুখী করার জন্যে শচীদেবী 'অত্যন্ত রূপসী' বিষ্ণুপ্রিয়া'র সাথে পুত্রের বিবাহ দেন। আর প্রাথমিক পর্যায়ে তাই এই বিবাহে নিমাই-এর অমতও ছিল। মাতৃ-ইচ্ছার মর্যাদা-দানে এক প্রকার বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। আবার নিত্যানন্দের দার-পরিগ্রহের পেছনে ছিলো মহাপ্রভুর ইচ্ছা ও শচী দেবীর (এক প্রকার) আদেশ।

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী দীর্ঘ বিবাহিত জীবন পান নি। তাঁর অকাল প্রয়াণই ছিল এর কারণ। বলতে গেলে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহিত জীবন দীর্ঘ ছিল, কিন্তু দীর্ঘ স্বামী-সঙ্গ পান নি তিনি। পক্ষান্তরে জাহ্নবা মাতা বেশ কয়েক বছর স্বামী নিত্যানন্দের সাথে সংসার-জীবন যাপন করেন।

একজন মহামানবের স্ত্রী হওয়ার গৌরব-প্রাপ্তি লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর জীবদ্দশায় হয়ে ওঠেনি। তিনি ছিলেন 'সংসারী' নিমাই-এর পত্নী। কিন্তু এ বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও জাহ্নবা মাতা দু'জনেই। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে নিমাই কম-বেশী দু'বছর সংসার-জীবন যাপন করেন (যদিও শেষ দিকে তা বিপর্যস্ত হতে শুরু করে)। এরপর নিমাই সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নেন। নিমাই সন্ন্যাস নেওয়ার ও 'মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হয়ে ওঠার পরও বহু বছর তাঁর 'স্ত্রী'র গৌরব নিয়ে জীবিত ছিলেন দেবী। আবার জাহ্নবা মাতা বিবাহের শুরু থেকেই প্রভু নিত্যানন্দের 'স্ত্রী'-এই বিরল গৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সাথে নিমাই-এর ছিলো সংসার-জীবন। আর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিমাই-এর সাথে কিছুকাল সংসার-জীবন যাপন করলেও নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে সংসার-ত্যাগ করে গেলে স্বামী-অনুগামিনী হয়ে নিজের মতো ক'রে যোগিনীর মতই প্রায় ধর্মাচরণ ক'রে গেছেন। জাহ্নবা মাতা কিন্তু স্বামী বর্তমানেই তাঁর সাথে ধর্মাচরণ করতেন ও নিত্যানন্দ প্রভুর দেহত্যাগের পরও তা চালিয়ে যান।

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উভয়েই বৈষ্ণবীয় ধারার পরিবর্তনে বিশেষ কোন ভূমিকা নেন নি। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী'র সে অবকাশই ছিলো না। আর ধর্মাচরণে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র নিষ্ঠা ও কাঠিন্য দ্বারা কেউ প্রভাবিত হলেও তিনি নিজে উপরোক্ত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন নি। নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে চলে গেলে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৃহেই

দ্বিতীয় মতেরও যে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু জাহ্নবা মাতা এক্ষেত্রে শিষ্যত্বদান, শিষ্যদের প্রেরণ ইত্যাদির দ্বারা বৈষ্ণবীয় ধর্মের ধারা বর্ধনে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, বৈষ্ণব ধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ভূমিকা জাহ্নবা মাতার অবদান। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী বা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এক্ষেত্রে সে রকম কোনো ভূমিকা চোখে পড়ে না।

শিষ্য-গঠনের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী তাঁর স্বল্প জীবনে কোন শিষ্য গ্রহণ ক'রে যেতে পারেন নি। সেই অবকাশও ছিলো না। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তেমন ভাবে বৈষ্ণবীয় ধর্মান্দোলনে নেতৃত্ব না দিলেও একজন মাত্র মন্ত্র-শিষ্য করেছিলেন। তিনি হলেন বংশীবদন*। কিন্তু জাহ্নবা মাতা দীক্ষা দিতেন। শোনা যায় তিনি প্রচুর শিষ্য গঠন করেছিলেন। এইভাবে কয়েকটি সূত্রের ওপর নির্ভর ক'রে চৈতন্যযুগের এই তিন নারীর মধ্যে তুলনা করাই যায়। তবে একথাও স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, এঁরা তিনজনই ছিলেন স্বতন্ত্র, এরা নিজের নিজের জায়গায় নিজেদের ভূমিকা ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথেই এঁরা পালন ক'রে গেছেন। সামগ্রিক বিচারে তাই এঁরা তিনজনেই ছিলেন চৈতন্যযুগের তিন বিদুষী নারী।

তথ্যসূত্র :-

১. শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী (সম্পাদক ও প্রকাশ), শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (প্রথম দ্বিতীয়-তৃতীয় কান্ড), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম, হালিশহর, পৃ. ১৩২।
২. ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, মহাপ্রভুর দুই প্রিয়া, শ্রীচৈতন্য অনুধ্যান, ১৩১৮ (ব.), শ্রীগুরু সঙ্ঘ আশ্রম, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
৩. শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, সাল অনুল্লিখিত, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ. ১২৯।

*শ্রীছকড়ি ও শ্রীমতী চন্দ্রকলাদেবীর সন্তান ছিলেন বংশীবদন। তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

কিংশুক ISSN 2394-5877

পত্রিকা দপ্তর

[illegible] রোড, পো: [illegible], পশ্চিম মেদিনীপুর,৭২১০০৪
মোবাইল-[illegible], ইমেইল- patrika.kingshuk@gmail.com

কার্যালয় দপ্তর

মুকুট বাড়ি,৪৭৯/বি,এস.ভি.রোড, ওয়েস্ট রাজাপুর,
পো: - যাদবপুর,কলকাতা-৭০০০৩২ পশ্চিমবঙ্গ

ওয়েবসাইট: http://www.kingshukpatrika.com/

'কিংশুক' পত্রিকার পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে, শ্রী কুণাল চ্যাটার্জী [ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজের (নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা) বাংলা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ, হাওড়া)-এর বাংলা বিভাগের গবেষক] 'কিংশুক' সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল ২০১৮, চতুর্থ বছর, চতুর্দশ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'চৈতন্যযুগের তিন নারী:লক্ষ্মীপ্রিয়া,বিষ্ণুপ্রিয়া ও জাহ্নবা'।

তাং- ২৫/০৬/২০১৮

স্থান- খড়্গপুর - ৫

প্রধান সম্পাদক কিংশুক

অর্পিতা মণ্ডল

অর্পিতা মণ্ডল

KINGSHUK
Mukut Bari
479/B, S.Y. Road, West Rajapur
P.O.-Jadavpur Kolkata-700 032

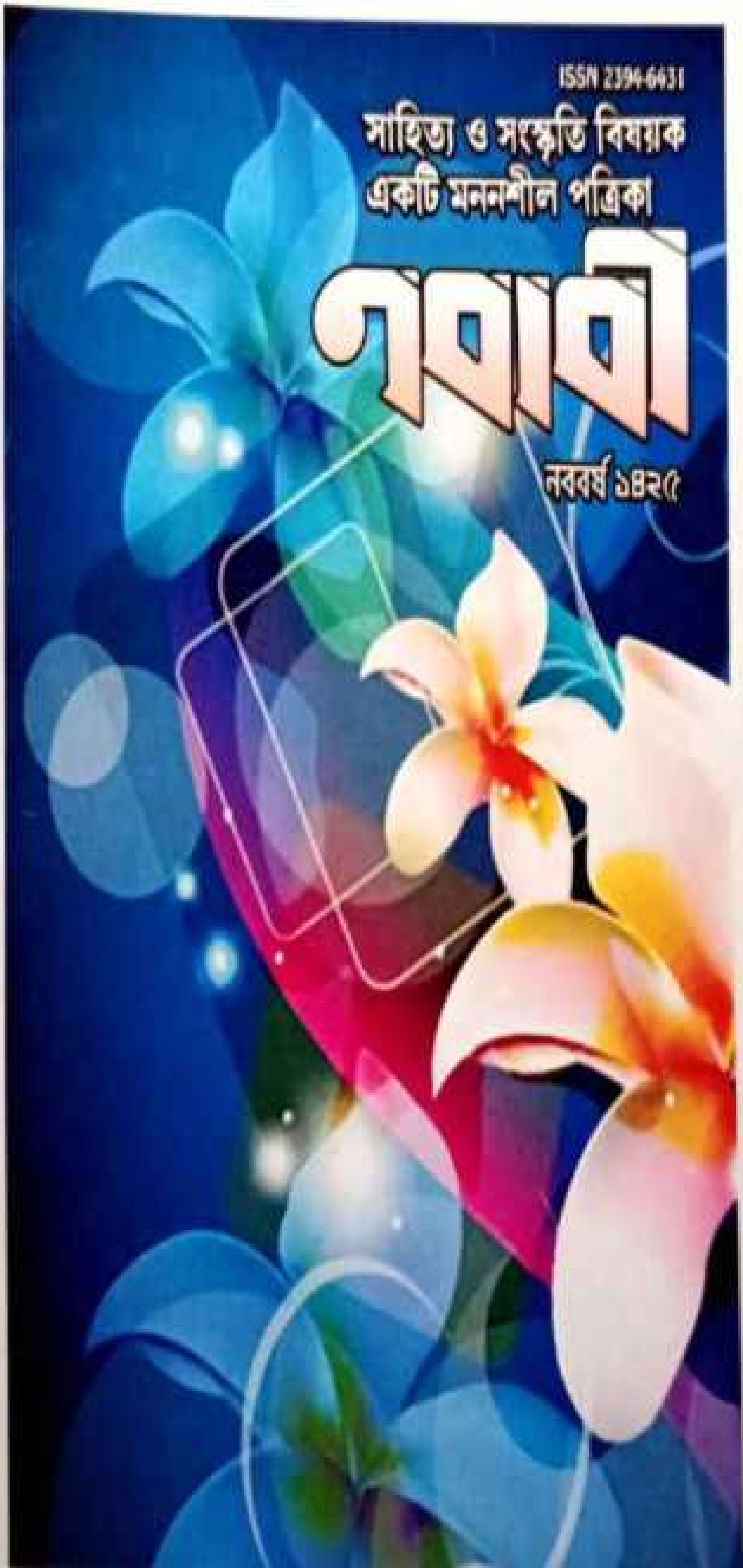
ISSN 2394-6431
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
একটি মননশীল পত্রিকা
নবাবী
নববর্ষ ১৪২৫

নবাবী

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
একটি মননশীল পত্রিকা

◆

সম্পাদক
জ্যোতিরঞ্জন সাহা,
চলভাষ : ৯৮৩৬২-১৬৫২৯
৯৫৭৭৩-৮৫১১২,
e-mail id : patrika.nababi@gmail.com

◆

সম্পাদকীয় দপ্তর
৪৩, এম. বি. রোড
পো: ইছাপুর-নবাবগঞ্জ
উত্তর ২৪ পরগণা
পিন-৭৪৩১৪৪

◆

প্রকাশক
সুব্রত সেনগুপ্ত
৪৩, এম. বি. রোড
পো: ইছাপুর-নবাবগঞ্জ
উত্তর ২৪ পরগণা
পিন-৭৪৩১৪৪

◆

❑ বৈশাখ ১৪২৬ ❑ ১ম বর্ষ ❑
❑ প্রথম সংখ্যা ❑

❑ সম্পাদকের কলম
❑ প্রিয় সম্পাদক
❑ ধারাবাহিক স্মৃতিকথা ৩
• সৌমেন বসু
❑ প্রবন্ধ ১৭
• তুষার চ্যাটার্জী
• মধু মজুমদার ২৩
• সাগরী চক্রবর্তী ২৭
• সুজন মুখোপাধ্যায় ৩২
❑ কবিতা ৩৪
৩৮—৪৩
• কল্যাণ মিত্র
• অশোক মুখোপাধ্যায়
• শোভন মণ্ডল
• রাজন ঘোষ
• সুদীপ ঘোষাল
• জ্যোতিরঞ্জন সাহা
• বিজন আচার্য
• অঞ্জন চক্রবর্তী
• অমৃতা চ্যাটার্জী
• প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
• সৌরভ সেনগুপ্ত
• সুব্রত সেনগুপ্ত
❑ গল্প
• নিয়তি রায়চৌধুরী ৪৪
• অনিন্দিতা গোস্বামী ৪৮
• সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
• মহুয়া মল্লিক ৬১
• সাবর্ণী বসু চৌধুরী ৬৬
• শেলী মুখোপাধ্যায় ৬৯
❑ অল্প কথায় গল্প
• অরিন্দম গোস্বামী ৭২
• স্বাতী বৈরাগী ৭৪
• অনন্ত মিত্র ৭৫
• মানস সরকার ৭৬
• সুলেখা সরকার ৭৭
❑ বই আর বই
• দেবাশিস সেনগুপ্ত ৭৮
❑ প্রচ্ছদ
• ভাস্কর দত্ত

❑ অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার
শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগণা
চলভাষ : ৯৪৩৩৪২৫৭৮৫

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

কুণাল চ্যাটার্জী

বিষয়বস্তু—মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গৃহজীবনের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে মহাপ্রভু'র পদাবলী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মহাপ্রভু'র সূত্র ধরেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও বৈষ্ণব পদাবলীতে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর জীবনের নানা দিক বৈষ্ণব পদাবলীতে উঠে এসেছে। এই লেখায় সেই বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দ—বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ, গৌরচন্দ্রিকা।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মের বহু পূর্বেই। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি হিসাবে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ছিলেন অবিসংবাদিত পদাবলীকার। কিন্তু ১৪৮৬ সালে মহাপ্রভু'র আবির্ভাব বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলল। তাঁর শুদ্ধ জীবন ও কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হল বাংলা সমাজ ও তার সাথে সাহিত্য। সমাজ শিক্ষা পরিশুদ্ধ ও মানব প্রেমের মন্ত্র আর বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা যেমন কুপ্রথা মুক্ত হলেন, তেমনই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য পেল নতুন ধারা—'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ' ও 'গৌরচন্দ্রিকা'। পদাবলীকারেরা নিজেদের পদে গৌরাঙ্গ তথা মহাপ্রভু'র কার্যাবলী, ভাবান্তর অবস্থা ও জীবনের নানা ঘটনা ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। সেই সূত্র ধরেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে চলে এলেন নিমাই বা মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গৃহজীবনের দ্বিতীয় পর্বে তাঁর জীবনে আবির্ভূতা হন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। প্রাণ-প্রিয় পত্নী লক্ষ্মীদেবী*-এর অকাল প্রয়াণের পর যখন সংসার-জীবনে একপ্রকার বৈরাগ্য দেখা দেয় নিমাই-এর তখন শচীদেবী তাঁর পূর্ব-পরিচিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে পুত্রের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই মতো আনুমানিক ১৫০৬ (মতান্তরে ১৫০৭) সালে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন।

এর পর কয়েক বছরের সংসার-জীবন এবং ১৫১০ সালের ২৬ জানুয়ারির (১৪৩১ শকাব্দের ২৯ মাঘ) নিমাই সন্ন্যাস নেন। মহাপ্রভু'র জীবনের এই পর্বের বহু ঘটনা বৈষ্ণব পদাবলীর নানা পদে উঠে এসেছে। সেই সাথে এসেছেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও। এই বার এমনই কিছু পদ নিয়ে আলোচনা করা যাক যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পাওয়া যায়—

বলরাম দাসের "ঘোমটার আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী"[১] পদটিতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহ আসরের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়—

"ঘোমটার আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। আড় চোখে দেখে পতি-মুখ-ছবি॥
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ। কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ॥"

---

* লক্ষ্মীদেবী হলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। এঁনার পিতা ছিলেন বল্লভাচার্য। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সাথেই মহাপ্রভু'র প্রথম বিবাহ হয়। অতি অল্প বয়সে ও স্বল্প দাম্পত্য জীবনেই সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

অর্থাৎ, তরুণী ভার্যা নিমাইকে দেখে তিনি যে মুগ্ধ, তা এখানে স্পষ্ট।*

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী'র পদ আছে যেখানে নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া'র সুখী দাম্পত্যের ছবি দেখা যায়। যেমন—নরহরিদাসের "আজু রতি কি মধুর রঙ্গে"[১] শীর্ষক পদে 'আঙ্গুলি' ও 'অঙ্গীর' গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া'র মধুর রঙ্গ-রসের কথা আছে। তেমনই "গোরা মরমে কি বুঝিল আনে" শীর্ষক পদে লোচনদাস নবদ্বীপ স্বামী-স্ত্রী, নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া'র অন্তরঙ্গতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"গোরা মরমে কি বুঝিল আনে।
চিত আর এক মনে সে মনে॥
অলসে অরুণ হইল আঁখি।
চারিপাশে চাহে সে রসে আঁখি॥
দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া গবাক্ষ দ্বারে।
অনিমিখ দিঠে দেখিল তারে॥
মদ মদ হাসি আঁখির কোণে।
না জানি কিবা কহিল মনে॥
সে রমণী মণি শুনিয়া লয়।
সখী সব জানি কি কথা কয়॥"

সংসার জীবন-যাপন করতে করতেই নিমাই সিদ্ধান্ত নেন গয়ায় পিতৃপিণ্ড-দানের জন্যে যাত্রা করবেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনের পর তাঁর মধ্যে ভাবান্তর দেখা যায়। আর এক মানুষ হয়েই তিনি যেন নবদ্বীপে ফিরে আসেন। নিজে যেমন এরপর কৃষ্ণপ্রেমে মজলেন, তেমনই কৃষ্ণনামের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেন নদীয়া। এর সাথে সাথে বিপর্যস্ত হতে লাগল তাঁর সংসার-জীবন। আর একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন 'জীবের উদ্ধার লাগি' সন্ন্যাস-গ্রহণের। স্বামীর সাথে আসন্ন বিচ্ছেদ নানা সংকেতে আতঙ্কিত হতে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা, বা পরিপার্শ্বিক কর্মে। যেমন, বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত বাসু ঘোষের একটি পদে এমনই কিছু বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে এইভাবে—

"পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
স্নান করি বাড়ি আসি শাশুড়ীরে বলে॥
... ...
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননি।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙিবে কপাল মোর পড়িবে বজ্জর॥"[২]

আলোচ্য পদে দেখা যায় স্নান সেরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্বশুর-ঘরে এসে শাশুড়ীমাতা শচীদেবীকে জানাচ্ছেন যে, আসন্ন অমঙ্গল-অনুভবে তাঁর প্রাণ কম্পমান। কারণ, তাঁর সাথে নানা অমঙ্গল-সূচক ঘটনা ঘটে চলেছে। স্নানরতা অবস্থায় তাঁর নাকের নাকছাবি ('নাকের বেশর') জলে পড়ে গেছে। সধবা নারীর পক্ষে যা অতীব অমঙ্গলজনক। তিনি আসন্ন বিপদ-অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভীত হয়েছেন আর এই অমঙ্গল যে নিমাইকেন্দ্রিক, তা-ও তিনি অনুভব করেছেন ও বলেছেন কপাল ভাঙা

* বিবাহের পূর্বে গঙ্গা'র ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিমাইকে দেখেছিলেন। আর তখনই নিমাই-গৌর তাঁর পূর্বরাগ জন্মেছিল।

হবে। বিরহিণী নারী'র স্বামী-বিচ্ছেদের প্রসঙ্গেই মূলত 'কপাল ভাঙা'র কথা আসে।

১৫১০ সালের ২৫ জানুয়ারি (১৪৩১ শকাব্দের ২৭ মাঘ) শেষ রাতে নিমাই গৃহত্যাগ করেন সন্ন্যাসের নিমিত্ত। এরপর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিলাপের চিত্র বাসু ঘোষের একটি পদে বর্ণিত হয়েছে, দুঃখী অর্ধাঙ্গিনী—

"কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া   নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাইয়া লোটাইয়া ক্ষিতিতলে।
হরে নাথ কি করিলে   পাথারে ভাসিয়া গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥"[১]

ক্রন্দনরতা ও বিপর্যস্তা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র এই চিত্র অত্যন্ত করুণ। নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করে গেলে দেবী একেবারে ভেঙে পড়লেন। তিনি বিলাপ করে ক্রন্দন করেছেন। তবে পরে তাঁর এই ক্রন্দন সবাই হৃদয়কে করুণে দ্রবীভূত করে।

পতি-বিচ্ছেদ বেদনায় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন বাধাতুরা। ধীরে ধীরে তাঁকে হতাশা গ্রাস করে। আর তাই ভণিতায় বাসু ঘোষ-এর একটি পদে দেখা যায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বলছেন—

"সখি! দিন গনি গনি   দিন ফুরাইল   আর কত কাল জীব।
থাকিতে জীবন   গৌরাঙ্গবদন   আর কি দেখিতে পাব॥"[২]

আলোচ্য অংশে দেবী হতাশায় নিমজ্জিতা হয়েছেন, ভেবেছেন, প্রাণ থাকতে আর বুঝি পতি'র সাথে আর তাঁর মিলন সম্ভব হবে না।

নিমাই-কেন্দ্রিক বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি এমন কিছু পদ আছে, যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র বিশেষ কোন কাজ (doing)-এর কথা নেই, অপরের মুখে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে মাত্র। যেমন—"সকল বৈষ্ণব মেলি"[৩] বাসুদেব ঘোষের এই পদে পদকর্তার কথাতেই তাঁর নাম উঠে এসেছে ("বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি"), বা, "যেমতের নদীয়ার চাঁদ গোরা নিমাই"[৪] শীর্ষক বাসুদেব ঘোষের অন্য পদে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র নাম উচ্চারিত হয়েছে শচীদেবী'র মুখে ("বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলি গলায় গাঁথিয়া")।

আবার এমন কিছু বৈষ্ণব পদাবলী'র পদও পাওয়া যায়, যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র বন্দনাও আছে। যেমন—দুঃখী দীন কৃষ্ণদাসের "জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র"[৫] পদে আছে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র বন্দনামূলক "জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিণী" (এখানে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী'রও উল্লেখ আছে)।

অর্থাৎ, বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী'র বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। কখনও তাঁর সুখী দাম্পত্যের কথা, কখনও নিমাই-সন্ন্যাস নেওয়ার পরবর্তী অবস্থার কথা বৈষ্ণব পদাবলীতে উঠে এসেছে, তাই বলাই যায়, বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রসঙ্গ বহুমাত্রিক। তবে একথাও বলা বাহুল্য, তাঁর প্রতিটি অবস্থানের নেপথ্যে থেকে গেছেন নিমাই, বা গৌরাঙ্গ বা মহাপ্রভু।

তথ্যসূত্র :

১. মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ২০০৫, মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থা, কলকাতা, পৃ. ৫৩।

২. [illegible] (সংগ্রাহক, সম্পাদক ও প্রকাশক), বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম, হালিশহর, ১৪০৬ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৬।

৩. তদেব, পৃ. ৮০-৮১।

৪. [illegible] বসু (সম্পাদক), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন সংকলন), দ্বিতীয় মুদ্রণ, বিশ্বভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫১।

৫. তদেব, পৃ. ৫৯।

৬. [illegible] (সম্পাদক ও প্রকাশক), বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম, হালিশহর, ১৪০৯ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৪।

৭. মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ২০০৫, মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থা, কলকাতা, পৃ. ২৫৯।

৮. [illegible] বসু (সম্পাদক), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন সংকলন), দ্বিতীয় মুদ্রণ, বিশ্বভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৮।

৯. তদেব, পৃ. ২১৭।

উক্ত-গ্রন্থের পদগুলির বানান, পাঠ ও ভণিতায় প্রাপ্ত পদকর্তাদের নাম এখানে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা হয়েছে।

নবাবী

Editorial Office : NABABI, 43 S. B. Road
Ichapur - Nawabganj, 24 Pgs. (North)
Pin - 743 144. Ph. 983621655

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে শ্রী কুশল চ্যাটার্জী নবাবী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি মননশীল পত্রিকার, নববর্ষ (বৈশাখ) ১৪২৫, ২৪ বর্ষ সংখ্যায় 'বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। পত্রিকা প্রকাশের সময় ওর পরিচয়টি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

কুশল চ্যাটার্জী বর্তমানে বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজে (নৈহাটী, উত্তর ২৪-পরগনা) বাংলা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ, হাওড়া) এর বাংলা বিভাগের গবেষক।

স্থা : ইছাপুর নবাবগঞ্জ
১৬ই এপ্রিল ২০১৮

জ্যোতিপ্রকাশ সাহা
সম্পাদক, নবাবী
৪৩, এস, বি, রোড
ইছাপুর-নবাবগঞ্জ
পিন-৭৪৩১৪৪

বাংলা ছোটোগল্প কথা

সম্পাদনা

ড. মোহিনীমোহন সরদার ও ড. শেখ কামাল উদ্দীন

Bangla Choto Gopo Kotha, Porbo-1

Edited By:
Dr. Shaikh Kamal Uddin

and

Dr. Mohini Mohan Sardar

প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক:
সুধা পাল ধর
গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস
১নং রোড, প্রফুল্লনগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
ফোন নং: ৯৭৩৩৫৩৫৩৪১, ৯৮৩৬৭৬২৭৬২
ওয়েবসাইট: www.gatewaygraphics.in
ইমেল: contact@gatewaygraphics.in

প্রচ্ছদ:
অমিতাভ দাশ

অক্ষর বিন্যাস:
গেটওয়ে গ্রাফিক্স, হাবড়া

ISBN: 978-81-945505-7-0

মূল্য: ৫০০ টাকা

সূচিপত্র

- ড. কুশল চ্যাটার্জী

  'হারানের নাতজামাই': একটি পর্যালোচনা...২৬২
- বিশ্বজিৎ সরকার

  গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনায় নকশা শিল্প: প্রসঙ্গ রসময়ীর রসিকতা... ২৭৪
- নয়ন সিরাজ

  মনীশ ঘটকের 'ভুখা ভগবান': ক্ষুধিতের গদ্য-কথন... ২৯৩
- রুমী কুমারী

  বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা': প্রসঙ্গ সমাজ চিত্র... ৩০০
- দীপর্ণা বনিক

  জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি': সৌন্দর্যচেতনা ও মনস্তাত্ত্বিকতার এক অভিনব নির্মাণ... ৩০৮
- সোমনাথ মুর্মু

  'তারিণী মাঝি': চরিত্র-চিত্রণে তারাশঙ্কর... ৩১৯
- সঞ্জয় কুমার

  'গিন্নী': একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা... ৩২৪
- মোঃ নাজমুল হাসান

  'সিঁড়ি': নারীর কর্মজীবনে পদোন্নতির গল্প... ৩৩০
- লোকনাথ সাহা

  তারাশঙ্করের 'না': অন্য চোখে...৩৩৬
- অপর্ণা মণ্ডল

  বনফুলের গল্প '[illegible]': আত্মমর্যাদার মূল্যায়ন...৩৪১
- স্বাতী দাস

  জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' গল্পের সামগ্রিক আলোচনা... ৩৫১
- শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য

  'হারানের নাতজামাই' নারীর সংগ্রামী চেতনা ও মূল্যবোধের জাগরণের আখ্যান...৩৫৭
- রানা ভট্টাচার্য

  সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' সাহিত্যের আসরে জীবন্ত দলিল...৩৬৪

'হারানের নাতজামাই': একটি পর্যালোচনা

ড: কুশল চ্যাটার্জী

[১]

বাংলা সাহিত্যের সাথে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক বহুদিনের। বহু উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। যেমন- রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', মুকুন্দ দাসের 'ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি', রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', গঙ্গাচরণ নাগের 'রাখীকঙ্কন', নজরুলের 'বাঁধনহারা' ইত্যাদি। তেমনি তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে। কি সেই তেভাগা আন্দোলন?

মালিকের জমিতে জান-প্রাণ লড়িয়ে বিপুল ফসল ফলানোর পর যৎসামান্য প্রাপ্তি ছিল ভাগচাষীদের। নিরন্তর এই বঞ্চনার ফলায় বিদ্ধ ভাগচাষিরা শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ (> তেভাগা) দাবি ক'রে এই আন্দোলনের সূত্রপাত, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে ও ধারাবাহিকভাবে চলেছিল ১৯৪৭ (১৯৫০) সাল পর্যন্ত। বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, ইলা মিত্র, অজিত বসু প্রমুখেরা ছিলেন এই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। শিবরাম ও সমিরুদ্দিন ছিলেন এই আন্দোলনে শহীদ। এই আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য কি লক্ষণীয়—

ক) ভাগচাষীদের সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

খ) ধর্মনিরপেক্ষতা

গ) নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

তেভাগা আন্দোলন ও কৃষি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বা এগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপিত ক'রে বহু বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। যেমন—

...ভাষের 'মহাশক্তি', মিহির আচার্যের 'দালাল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন্দুক', সমরেশ বসু'র 'প্রতিরোধ', সৌরী ঘটকের 'কমরেড', 'অশোকের ...' প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ' হারানের নাতজামাই' গল্পটি। ১৩৫৭ সালে গল্পটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে গল্পটি ...(ছোটবড়ো গল্পগ্রন্থ)-এ স্থান পায়।

।২।

তেভাগা আন্দোলনকে বক্ষে ধারণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পটির আত্মপ্রকাশ। আন্দোলনের পন্থা, পুলিশী অত্যাচার, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-সবই এ গল্পে গল্পকার সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক) পুলিশ আগমনে বার্তাপ্রেরণের পন্থা: আন্দোলনকে ও আন্দোলনকারীদের বাঁচানোর জন্য আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তার জন্যে প্রয়োজন কৌশল। গল্পে পাই— "শাঁখ আর উলুধ্বনিতে গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।"[৩]

খ. পুলিশি সক্রিয়তায় ও বিশ্বাসঘাতকতা: আন্দোলনকে দমানোর জন্য রই পুলিশি সক্রিয়তা। বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন সময় সাফল্য পায়নি, তার অন্যতম কারণ বিশ্বাসঘাতকতা। এই গল্পেও এই দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে—

"কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আটঘাট বেঁধে বসবাস কোনো চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুন কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারানের। বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকেই বাঁধাই ছিল। ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে। খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ।..."[৪]

গ. নেতাকে আগলাতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ: যে কোনো বিদ্রোহ, আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পরিণতিদান করার জন্যে দরকার যোগ্য নেতৃত্বের। আলোচ্য গল্পে সেই ভূমিকা নিয়েছে ভুবন মণ্ডল। আর সেই নেতাকে রক্ষা করাও আন্দোলনে জড়িত সাধারণ মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। এই গল্পেও পাই—

১. "ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে।... ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্য।"[৫]

২. "... লাঠি-সড়কি-দা-কুড়াল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে।"[৬]

৮. পুলিশি অত্যাচার ও আন্দোলন বাঁচানোর ছল: আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ আশ্রয় নেয় দমন-পীড়নের। পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা আন্দোলনকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক পন্থা নেয়, নেয় নানা ছলের আশ্রয়। দেখা যায়, ফুলন মণ্ডল হারানের বাড়িতে লুকায়িত। খুব দরকার সেই জন্য হারানের বাড়ি খুঁজে বার করা। তাই—

"সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে পেটি পাটি নামক মণ্ডলকে তাই জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'হারান দাসের কোন বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারান ছাড়াও যেন কয়েক গন্ডা হারান আছে গাঁয়। তোমার মতো রাখাল প্রশ্ন করে, 'আজ্ঞা, কোন হারান দাসের কথা বলেন?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, ...দেখ হুজুর চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া না, একেবারে ফুর্তিবাজ হয়ে উঠেছে হারামজাদিরে।"

৯. পুলিশি দৃষ্টিভঙ্গি: আন্দোলনকারী, বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসবাদীদের সাথে সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশি জুলুম, কথা বার করার কৌশলের পাশাপাশি সম্মানহানিকর বাক্যপ্রয়োগ বা কর্মপ্রয়োগের বহু নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ এক পন্থা নিজের বা নিজেদের supremacy জাহির করার। আদিম ও মানবীয় প্রবৃত্তির পাশাপাশি বিকৃত কামনাবাসনার হীন প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন সময় নারীদের প্রতি যৌন ইঙ্গিতবাহক বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য 'হারানের নাতজামাই' গল্পেও দেখা যায় মন্মথ দারোগাকে এমনই কিছু কদর্য বাক্য প্রয়োগ করতে—

১) "ফুলনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।"
২) "বাঃ, তোর তো মাসী ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে।"
৩) "... ছাড় তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—" ৮

কৃষক আন্দোলনকে প্রেক্ষাপটে রেখেও পুলিশি জুলুম আর প্রাচীন মানুষের প্রতিরোধী মানসিকতা 'হারানের নাতজামাই' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, বিস্তার, ব্যাপকতা ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। হয়তো একটি উপন্যাস নয়; হয়তো একটি 'ডিটেকটিভ' গল্পই।

[৩]

ব্যক্তি, বস্তু বা রচনা সবেতেই নামকরণটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাম কোনো কিছুকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দান করে, নাম প্রদান করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পটির নামকরণ বিশ্লেষণ করলে যে রূপটি পাওয়া যায়, এই চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে এমন হয়—

গল্পের নামানুসারে প্রকৃত হারানের নাতজামাই জগমোহন, "...বয়স তার ছব্বিশ-সাতাশ, বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো।"[১৬] কিন্তু গল্পে অবস্থার প্রেক্ষিতে সাময়িক ভাবে হারানের নাতনি ময়না'র স্বামী অর্থাৎ হারানের নাতজামাই হয়ে উঠেছে ভুবন মণ্ডল, কৃষক আন্দোলনের নেতা।

দারোগা মন্মথ এসেছে আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডলকে ধরতে। সালিগাঁয়ের গ্রামবাসী জোটবদ্ধ হয়েছে তাদের নেতাকে 'পুলিশে যাতে ধরা নিয়ে যেতে না পারে' তার জন্যে। পুলিশের সাথে বচসা চলাকালীন গ্রামবাসীদের পুলিশের রোষ থেকে বাঁচাতে, অনর্থক রক্তপাত ঠেকাতে জনৈক ময়নার মা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, পুলিশের ভুবন মণ্ডলকে না চেনার সুযোগ নিয়ে, তাদের বাড়িতে লুক্কায়িত ভুবন মণ্ডলকে কন্যার স্বামীর ছদ্ম পরিচয়ে তাকে কন্যার সাথে এক ঘরে রাত্রিকালীন শয়নের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। তাদের আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডলকে পুলিশের গ্রেফতারি থেকে বাঁচাতে এই ছদ্ম পরিচয় ও সঙ্কটকালীন সাময়িক অভিনয়ে ভুবন মণ্ডলও যোগ দেয়, সহযোগিতা করে। বিবাহিতা কন্যা, সমাজ ইত্যাদির নিরিখে এটি যে একপ্রকার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, ময়নার মা'র মতো বুদ্ধিমতীর অজানা ছিল না। তবু নিজেদের নেতাকে রক্ষা করতে

এই সাহসী পদক্ষেপ তার। পরবর্তীতে ময়নার মা'র প্রকৃত জামাই জগমোহন এসে পড়েন, আসে মন্মথ দারোগা আবার। দু'জনের থেকেই ময়নার মা'র এমনকি ময়নারও জোটে লাঞ্ছনা আর অপমান। গল্পের সূচনা থেকে যে টানটান উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের সূচনা হয়েছে, গল্পের সমাপ্তিতেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। আর এই উত্তেজনার এবং রোমাঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে গেছে 'হারানের নাতজামাই'। গল্পের আরও ঘনীভূত হয়েছে যখন ছদ্মবেশে হারানের নাতজামাই ভুবন মণ্ডলের পর গল্পের মাঝা-মাঝিতে ময়নার প্রকৃত স্বামী ও হারানের প্রকৃত নাতজামাই এবং এর পরপরই মন্মথ দারোগার আগমন হয় (গ্রামে)। আর তারপরেই ময়নার মা ও ময়নার উদ্দেশে মন্মথ'র সেই অবিস্মরণীয় উক্তি-

"বাঃ, তোর তো খাসা ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! ...আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—"।"

এই সময় শাশুড়ি মা'র মহৎকর্মের স্বরূপ ও গুরুত্ব বুঝতে না পারা জামাই জগমোহন, যে এতক্ষণ রত ছিল শাশুড়িমা ও স্ত্রীকে গঞ্জনাদানে; সেই হঠাৎ মন্মথ'র ময়নাকে ছুঁতে যাওয়া এবং ময়না'র মাকে অপমানে জ্বলে ওঠে। মন্মথ'র সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃত পুরুষ, প্রকৃত স্বামী ও প্রকৃত 'জামাই'হয়ে বলে—

"... মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন।"

গল্পের সূচনায় লোকজমায়েত হয়েছিল তাদের আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডলকে আগলাতে। এই ভুবন মণ্ডল, যে ছিল ছদ্ম হারানের নাতজামাই, তাকে কেন্দ্র করেই গল্প সূচনা ও অগ্রসরণ, তার জন্যই সালিগঞ্জের অধিবাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ। আবার গল্পের মাঝ বরাবর আগমন হয় হারানের প্রকৃত নাতজামাই জগমোহনের, পুলিশের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে পুলিশের অত্যাচারেও দেখা যায় মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ, প্রতিবাদ—"বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমে নি, দলে দলে লোক ছুটে আসে চারিদিক থেকে; ...কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক পথ আটকায়।... এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকে গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে। মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।"[৩৪]

সবদিক বিবেচনা করে তাই বলাই যায় যে, 'হারানের নাতজামাই' গল্পের নামকরণ ব্যক্তিধর্মী ও ব্যঞ্জনাধর্মী উভয় অর্থেই সার্থক হয়েছে।

।৪।

'হারানের নাতজামাই' গল্পে খুব বেশি না হলেও ছোটো-বড়ো মিলিয়ে বেশ অল্পসংখ্যক চরিত্র নেই। তবু সব চরিত্র ছাপিয়ে উঠেছে ময়নার মা চরিত্রটি। গল্পের গুরুত্বপূর্ণ নামকরণ থেকে ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক— এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বোধ হয় এক পুরুষই হবে। সত্য তা-ই। তবু ভুবন মণ্ডল, জগমোহন বা মন্মথের নতুন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে এসেছে ময়নার মা।

১. পরিচয়: ময়নার মা হারান দাসের মেয়ে ("বুড়া বাপটার তরে ভাবনা")। তার যে বর্ণনা গল্পে পাই, তা এইরকম—

"...প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ- দুর্দশার ছাপ ও রেখা রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। খুঁটি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁট চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।"[৯]

২. জনদরদি: আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডলকে খুঁজতে এসেছে মন্মথ দারোগা। খবর আছে হারানের বাড়ি লুকিয়ে আছে ভুবন মণ্ডল। গ্রামবাসী একরাত্রি তারা হারানের বাড়ি তল্লাশি করতে দেবে না। মন্মথও ছাড়ার পাত্র নয়। গ্রামবাসীদের ওপর অনর্থক পুলিশি অত্যাচার আর রক্তপাত ঠেকাতে জনদরদি ময়নার মা এক অভিনব পন্থা নেয়- ভুবন মণ্ডলকেই জামাই হিসাবে প্রতিপন্ন ক'রে অবশ্যম্ভাবী রক্তপাত ও পুলিশি অত্যাচার থেকে গ্রামবাসীদের সে রক্ষা করে।

৩. কৌশলী: সমগ্র গল্প জুড়ে ময়নার মা'র একাধিক কৌশলী কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন:

ক) পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ থামাতে পদক্ষেপ: "হও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোনো আসামি নাই। ...দারোগাবাবু তল্লাশ করতে চান, তল্লাশ করেন।"[১০]

খ) মন্মথ'র সামনে থেকে ভুবনকে সরানো: "শীতে কাঁপুনি ধরেছে গো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা।"[১১]—ইত্যাদি

৪.বাগ্মী;ময়নার মা অসাধারণ বাগ্মীও বটে। একাধিকবার তার অসাধারণ বাগ্মীতায়, সে পরিবেশ সামাল দিয়ে প্রতিপক্ষকে দিয়েছেন নীরব করে—

ক) জামাই 'চুপেচুপে' আসা প্রসঙ্গে গৌর মাউকে প্রত্যুত্তর: "সদর দিয়া

আছিহে। তোমার একটা মাইয়ার লাইগ্যা জামাই। চুপেচুপে আসে, নের জন্যই সব দিয়া আছিহে।”[১৭]

খ) “বাপ নাকি?”[১৮] বলা জগমোহনের বলা কথার উত্তর: “বাপ মা মণ্ডল (ভুবন) দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্ম দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ কইরা, দল বাঁধাইছে।...”[১৯] —ইত্যাদি।

৫. কূটবুদ্ধি: ময়নার মা কূটবুদ্ধিতাও করতে জানে। বাড়িতে আসা জামাইকে সে যে শুধুই আদর-যত্নই করেছে, তা-ই নয়, বেয়াই-বেয়ানের খোঁজও নিয়েছে—

ক) “আসো বাবা আসো।...ভালো নি আছে বেবাকে বিয়াই-বিয়ান পোলামাইয়া?”[২০]

খ) “খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বসো বাবা, বসো।”[২১]

গ) “মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।”[২২]

ঘ) “...আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়া মুড়ি কিছু জোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।”[২৩] —ইত্যাদি

৬. স্পষ্টবক্তা: ময়নার মা স্পষ্টবক্তা। অন্যায় সে মানতে পারে না। জামাইয়ের হীন সন্দেহ ও কটূ আচরণের প্রেক্ষিতে সে তাকে শয়তান বলে দিতে পারে—

“বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভাইয়ের লগে ক্যান কথা কয়।”[২৪]

৭. অসহায়তা: তার স্বার্থত্যাগ ও মহৎ কর্মের মাহাত্ম্য জামাই জগমোহন বোঝেনি। পাশে তো জামাই থাকেই নি, উল্টে নানাভাবে তাকে ও তার কন্যাকে দিয়েছে গঞ্জনা, করেছে অপমান। এখানেই সে অসহায়—

“জোতদারের সঙ্গে, দারোগা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করা চলে; অবুঝ, পাগল জামাইয়ের সঙ্গে লড়াই নেই!”[২৫]

৮. আত্মত্যাগ: আন্দোলনকে বাঁচাতে, আন্দোলনের নেতাকে বাঁচাতে ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ নেয় ময়নার মা। জামাইয়ের ছদ্ম পরিচয়ে এক পর-পুরুষকে মেয়ের শোয়ার ঘরে (একসাথে শোয়ার অভিনয় করার জন্যে) প্রেরণ করে। ময়নার মা কি জানতো না যে, এর জন্যে তাকে মাশুল গুনতে হবে? তার মতো বুদ্ধিমতীর তো

ভাবনা ছিল না। তবু তার এই স্বার্থত্যাগ বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্যে।

৯. যথার্থ নেত্রী: আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডল। তাকে রক্ষা করতেই যত কাণ্ড। তবু তাকে শুধু একটি কথা ("আমি যাই, সামলাই গিয়া"[৭]) ছাড়া সমগ্র গল্পে নেতার ভূমিকায় দেখা যায়নি তেমন ভাবে। বরঞ্চ নেতৃত্ব দিয়েছে ময়নার মা-

ক) কর্ম (Doing):

১. "তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারানকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে।"[৮]

২. "ময়নার মা নিজের টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙিন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলোভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়িখানা"[৯]

খ) নির্দেশদান (Instructions):

১. (ময়নাকে) "ঘোমটা দিবি, লাজ দেখাবি। জামাইয়ের কাছে যেমন দেখান।"[১০]

২. (ভুবনকে) "ভালো কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন। বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিনাড়া, থানা গৌরপুর—"[১১]

গ) সহন (Suffering):

সমগ্র গল্প জুড়ে ময়নার মা অনেক কিছু সহ্য করেছে—পড়শীদের সন্দিগ্ধতা, মন্মথের অপমান, জামাইয়ের অপমান, গঞ্জনা- ইত্যাদি।

১০.নামহীন নারীসমাজের মুখপাত্র: কৃষক আন্দোলন ও বহু আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পুরুষদের পাশাপাশি প্রকাশ্যে ও গোপনে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলন সফল হোক বা ব্যর্থ, নারীদের আত্মত্যাগ ছিল সেই কর্মযজ্ঞের সমিধ-স্বরূপ। সেইসব নাম-না-জানা বা আড়ালে হারিয়ে যাওয়া নারীদের প্রতিভূ যেন হয়ে উঠেছে ময়নার মা। তাই ব্যক্তিনামে নয়, 'কোনো-এক' ময়নার মা সে হয়ে উঠেছে। আন্দোলন ও তার নেতাকে বাঁচাতে সে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে দু'বার ভাবেনি। এই ময়নার মা চরিত্রটি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে হয়তো গল্পকার সেইসব নারীদের ও তাদের আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন।

[২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই'-এর কাঠামো সম্বন্ধে এবার একটু আলোচনা করা যাক—

আলোচ্য গল্পের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য যদি রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, তবে আমরা পাই নিম্নে অঙ্কিত এই চিত্রটি—

নিবিড় পর্যবেক্ষণে গল্পটি আলোচনা করলে দেখা যায়, এর সূচনা হয়েছে সমষ্টিগত সমস্যা, শোষণ-পীড়নের আবহে, সমষ্টির নেতা ভুবন মণ্ডলকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করতে সমষ্টিগত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। সমষ্টিগত সমস্যা-শোষণ-পীড়নকে প্রেক্ষাপটে রেখেই গল্প মধ্য গগনে যখন প্রবেশ করে, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় (অন্তত দৃশ্যত) ময়নার মা বা হারানের পরিবারের ব্যক্তিগত সমস্যার গল্প (যদিও প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমষ্টিগত সমস্যা-শোষণ-বঞ্চনা ও তজ্জনিত আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতাকে রক্ষা করার প্রয়াস ছিল বিদ্যমান)—শাশুড়ি মায়ের মহৎ কর্মের মর্ম না বুঝে জামাইয়ের ক্ষোভ, রাগ, মানাভিমান সংক্রান্ত টানাপোড়েন। বেশ কয়েকটি অংশ একত্রে উল্লেখ করাই যায়—

ক) "নিজের হইলে বুঝবা।"

খ) "মাইয়া মাথি কার লগে শুইছিলো কাইল রাইতে?"

গ) "অন্যের কাঁথা অন্যের বৌ হইলে কইত।"—ইত্যাদি

তবে শেষাবধি আবারও সমষ্টিগতা দেখা যায়, তবে এই সমষ্টির শোষণ-পীড়নের জন্যে শুধু নয়, শুধু হারানের পরিবারের ওপর হওয়া অত্যাচারের জন্যে—"পুলিশ সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমে নি, দলে দলে লোক ছুটে আসে চারিদিক থেকে; ...কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক নর প্রতিকার। ...এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকে গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে। মানুষের সমুদ্র, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।"[৮]

সার্থক ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এই ছোটোগল্পে সহজেই চোখে পড়ে। যেমন—

১) কাহিনির স্বল্প পরিসর/ প্রেক্ষাপট: কায়াগত বা প্রেক্ষাপটগত বা পরিসরগত স্বল্পতা ছোটোগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'হারানের নাতজামাই'-এও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মাত্র দুই সন্ধ্যা-রাত্রি'র ঘটনা এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

২) দীর্ঘ বর্ণনার অনুপস্থিতি: 'হারানের নাতজামাই' রোমাঞ্চ ও উত্তেজনায় ভরপুর, কিন্তু দীর্ঘ বর্ণনা এখানে নেই কোনো কিছুরই।

৩) চরিত্রের স্বল্পতা: ঘটনা পরম্পরায় বেশ কিছু চরিত্র আলোচ্য গল্পে এলেও, এটি কিন্তু আবর্তিত হয়েছে মূলত পাঁচটি চরিত্রকে নিয়েই—

ক) ময়নার মা, খ) মন্মথ দারোগা, গ) ভুবন মণ্ডল, ঘ) জগমোহন, ঙ) ময়না

৪) দৃঢ় গঠন: স্বল্প পরিসরে কাহিনি স্থাপন করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি কথন ত্যাগ করে গল্পটিকে দান করেছেন দৃঢ় গঠন।

৫) ভাষা: ছোটোগল্প সুলভ ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার ও দীর্ঘ বাক্য পরিহার এই গল্পের ভাষার এক অন্যতম ছোটোগল্প-সুলভ বৈশিষ্ট্য। যেমন—

"বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়।"[৯]

এছাড়াও এই গল্পের ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল—

ক. বর্ণনায় চলিত ভাষা: "থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন..."[১০]

খ. সংলাপে বাঙালী উপভাষা: "ভালা আছি। শুইছিলা তো?"[১১]

গ. বাঙ্গালী রীতি ভঙ্গ: "শীতে কাঁপুনি ধরেছে পো না দিয়া যাবা?"[৬] ('প্রাগৈ')

ঘ. নাটকীয় সংলাপধর্মীতা: "আবার কবে আইবা ?" "দেখি"[৭]

ঙ. আধুনিক শব্দের প্রয়োগ/ আধুনিকতা: "আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে–"[৮]

চ. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: "তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।"[৯] (আজি > আইজ= ই-কারের অপিনিহিতি)

ছ. সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার: "শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে জেগে উঠল..."[১০]

জ. কাব্যধর্মী বাক্য: "শীতের তেভাগা চাঁদের আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের,..."[১১]

ঝ. বাক্যের অলঙ্কারের প্রয়োগ: "... চোখ তার রঙিন শাড়ি জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না।"[১২] (সমাসোক্তি)

ঞ. নারী সংলাপে মেয়েলি কথনরীতির প্রয়োগ: "কী লো মায়না, জামাই কী কইলো?"[১৩]

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদক), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০১১, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১৩০

২. তদেব, পৃ. ১৩০

৩. তদেব, পৃ. ১৩০

৪. তদেব, পৃ. ১৩০

৫. তদেব, পৃ. ১৩১

৬. তদেব, পৃ. ১৩২

৭. তদেব, পৃ. ১৩৭

৮. তদেব, পৃ. ১৩৭

৯. তদেব, পৃ. ১৩৪

১০. তদেব, পৃ. ১৩৭

১১. তদেব, পৃ. ১৩৭

১২. তদেব, পৃ. ১৩৭

১৩. তদেব, পৃ. ১৩১

১৪. তদেব, পৃ. ১৩১
১৫. তদেব, পৃ. ১৩২
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৩২
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৬
১৯. তদেব, পৃ. ১৩৬
২০. তদেব, পৃ. ১৩৪
২১. তদেব, পৃ. ১৩৫
২২. তদেব, পৃ. ১৩৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৩৬
২৪. তদেব, পৃ. ১৩৫
২৫. তদেব, পৃ. ১৩৬
২৬. তদেব, পৃ. ১৩২
২৭. তদেব, পৃ. ১৩১
২৮. তদেব, পৃ. ১৩১
২৯. তদেব, পৃ. ১৩১
৩০. তদেব, পৃ. ১৩১
৩১. তদেব, পৃ. ১৩৪
৩২. তদেব, পৃ. ১৩৫
৩৩. তদেব, পৃ. ১৩৫
৩৪. তদেব, পৃ. ১৩৭
৩৫. তদেব, পৃ. ১৩৬
৩৬. তদেব, পৃ. ১৩৬
৩৭. তদেব, পৃ. ১৩৬
৩৮. তদেব, পৃ. ১৩৩
৩৯. তদেব, পৃ. ১৩৭
৪০. তদেব, পৃ. ১৩৭
৪১. তদেব, পৃ. ১৩৬
৪২. তদেব, পৃ. ১৩২
৪৩. তদেব, পৃ. ১৩০
৪৪. তদেব, পৃ. ১৩৩
৪৫. তদেব, পৃ. ১৩৪

কালান্তরে ছোটগল্প

বিভাজন পূর্ববর্তী রূপরেখায়

সম্পাদনা

অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী

রানা ভট্টাচার্য

Pathantar Chotogalpa Bivajaner Purbabarti Ruparekha
Edited by : Arindrijit Banerjee & Rana Bhattacharyya
Published by Joyjit Mukhopadhaya, Sopan
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
(033) 2257-3738 / 9433343616 / 9836321521
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
Website : www.sopanbooks.in

প্রথম প্রকাশ
২০২১

© অরিন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী ও রানা ভট্টাচার্য
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইটির কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়
সোপান
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮/৯৪৩৩৩৪৩৬১৬/৯৮৩৬৩২১৫২১
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
Website : www.sopanbooks.in

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১১এ, জগদীশ নাথ রায় লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৪৯৯ টাকা

ISBN : 978-93-90717-33-0

সূচিপত্র

[illegible] ধর্মনিরপেক্ষ মন ও জীবন — সাগর মণ্ডল ১১

[illegible]ক ভাবনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — রূপমায়া রায় ১৭

[illegible] : পোস্টমাস্টারের বেদনা [illegible] — নির্মল কুমার বর্মন ২৪

[illegible] তিন সঙ্গীর তিনটি গল্প : নারীচেতনার এক
[illegible] পাঠ — উত্তম পাত্র ২৮

[illegible] জনজীবনের সমন্বয়ে রবীন্দ্র ছোটগল্প — চঞ্চলকুমার মণ্ডল ৪২

[illegible] ছোটগল্পে আধুনিকতার অনুসন্ধান — দিবাকর বর্মন ৪৮

[illegible] উপেক্ষিতা নারী — সুরজিৎ মণ্ডল ৫৪

[illegible]ঠাকুরের অতিথি : বিশ্লেষণের আলোকে — সন্ধ্যা কুমার ৬০

[illegible] নির্বাচিত গল্প : অবদমিত মায়া ও সামূহিক কান্না — অভীপ্সজিৎ ব্যানার্জী ৭২

[illegible] কিশোর কিশোরী — রুক্মিনী দাস ৮০

[illegible] নারীর প্রতিবাদী সুরের অনুরণন — সৌমিক রায় ৮৬

[illegible]ঠাকুরের শাস্তি গল্প অবলম্বনে চন্দরার নীরব প্রতিবাদ — তুহিনা খাতুন ৯৫

[illegible] নির্বাচিত ছোটগল্প : শিশু মনস্তত্ত্বের ছবি — শেলী দত্ত ৯৭

[illegible] ভাষার কাহিনি - সোহিনী — অনুশীলা সাহা ১০৭

[illegible] 'সুন্দরম' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঙ্কাল
[illegible] এক নিবিড় পাঠ — শুভ্রা দে ১১৭

[illegible] : রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' ও 'স্ত্রীর পত্র' — সৌরভ সাহা ১২২

[illegible] প্রকৃতিকন্যা সুভার বুকে বেদনার শেল — কাজী রিংকু মণ্ডল ১৩০

[illegible] 'মহেশ' : গ্রামীণ অস্থায়ী সমাজজীবন — রাখী কুমারী ১৩৪

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের দেবী — শ্রীপর্ণা ঘোষ ১৪২

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী :
[illegible] ও বাৎসল্য রস — উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল ১৪৮

[illegible] : [illegible] অবদান — দীপঙ্কর মণ্ডল ১৫৫

[illegible] 'অতিথি' গল্পে প্রেম এবং পরিণয় — রীতা রাণী দে ১৬১

[illegible], বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় — কুশল চ্যাটার্জী ১৬৭

[illegible] ও হিঙের কচুরি : ছোটগল্পে পতিতা প্রসঙ্গ — প্রীতম চক্রবর্তী ১৭৮

[illegible] 'হিরণ' ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন — রাখিমা দাস ১৮৫

[illegible] মিত্রের 'তপু কেরানি' : চিরচরিত সংসার [illegible]
[illegible] জীবনকাহিনি — পবিত্র বিশ্বাস ১৯০

কিন্নর দল : বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায়

কুশল চ্যাটার্জী

বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যে তাঁর অনায়াস সন্তরণ। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প তাঁর হাতে পেয়েছে নতুন রূপ। পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩২), আরণ্যক (১৯৩৯), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৫০) ইত্যাদি উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি লিখেছেন মেঘমল্লার, মৌরীফুল, কুশল পাহাড়ী, ইত্যাদির মতো অজস্র ছোটগল্পও লিখেছেন। প্রসঙ্গে—"বিভূতিভূষণের ছোটগল্প বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রবাসীতে 'উপেক্ষিতা' প্রকাশ হবার সঙ্গে তিনি এক নতুন ঘরানার পল্লিবাংলার 'চিত্ররূপকার' বলে পরিচিত হলেন।"[১] আর এই পল্লীবাংলাকেই পটে ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল তাঁর কিন্নর দল (১৯৩৮) গল্পটি।

পল্লীগ্রাম: গরীব বলেই বেশি কুচুটে ও হিংসুক

"শিশুর মতো কৌতূহল এবং মতো কল্পনার প্রলেপ দিয়ে বিভূতিভূষণ অনন্যসাধারণ ভাষায় এমন গ্রামীণ জীবনের চিত্র এঁকেছেন যে, চিত্র হিসেবে তা অনবদ্য এবং অনতিক্রমনীয়"—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সাথে পল্লীবাংলার নিবিড় সংযোগ আছে। বাংলার কবি সাহিত্যিকেরা বারেবারে নিজেদের সাহিত্যে পল্লীবাংলাকে তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছেন, "ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসিবে-এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল, নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"[২]

প্রকৃতি তাপস সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পল্লীপ্রকৃতি। বিভূতিভূষণ শুধু পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনাই করেন নি, বর্ণনা করেছেন এর সাথেই সেই পল্লীবাংলার মানুষগুলির অন্তর্মানসকেও। তাঁর থেকে অনেক বেশী বর্ণিত হয়েছে পল্লীবাংলার মানুষগুলি, বিশেষত পল্লীবাংলার মহিলামহলের অন্তর্মানস

স্বরূপ ও তাদের স্বরূপ। সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক—

ক. গ্রামটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গল্পের একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদ থেকেই যে গ্রামটির প্রেক্ষাপটে গল্পটি রচিত হবে সেটির গঠনগত ও নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন—"পাড়াটায় ছ-সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস।"[৩]

খ. অধিবাসীদের পরিচয় :

এরপর লেখক তুলে ধরেছেন অধিবাসীদের মানসিকতা ও কার্যাবলী নানা নজির, যার থেকে আমরা গ্রামটির অধিবাসী, বিশেষত মহিলামহলের একটা পরিচয় পাই—

খ. ১. অর্থনৈতিক অবস্থা : " সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে কাছে ধার ধোর করে এরা দিন গুজরান করে।"[৪]

খ. ২. মানসিক স্বভাব বৈশিষ্ট্য :

খ. ২.১. সংকীর্ণতা: "গরীব বলে এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।"[৫]

খ.২.২. পরশ্রীকাতরতা: " পাড়ার মধ্যেই এরাই শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ। সে জন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে, এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে?"[৬]

খ.২.৩. সহবৎ শিক্ষাহীনতা: " প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে শান্তি—ষোল সতেরো বছরের কুমারী তার মায়ের বয়সী মন্টুর মার সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো—ও, সে কথা বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়ে মানুষ ঐ মন্টুর মা! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি, অমন নক্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ছুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকল না বা শাসন করলে না বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।"[৭]

খ.২.৪. জাতপাতে বিশ্বাস: "বোস গিন্নি বল্লেন—তাই বল। নইলে এমনি কোথা কিছু না শ্রীপতি বিয়ে করলে, একি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটা? হিঁদু তো? অর্থাৎ তাহলে ঝগড়াটা আরও জমে।"[৯]

খ.২.৫. অশ্লীলতা: "শান্তির মা বল্লে—তা হলে মেয়ে আর নয় মাগি বল! পাঁচ পণ্ডা বাপ মা তুমি ধরে বীজ রেখেছিল।"[১০]

তবে বিভূতিভূষণ শুধু এদের হীনতা দেখিয়েই থেমে থাকেন নি, এদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরণ (অথবা উত্তরণের সূচনা) ও দেখিয়েছেন, আর তা ঘটেছিলো গল্পের নায়িকা শ্রীপতি'র বৌ এর দ্বারাই (এরপরই পরবর্তী আলোচনার 'শ্রীপতির বৌ ও গ্রাম্য মেয়েমহল' এই অংশটিই যুক্ত হবে।) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন,

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পের অবলম্বন কি? মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো সুখ দুঃখের যে লীলাচাঞ্চল্য রহে, সুখের ভিতরে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইঙ্গিত রহে, বিভূতিভূষণ সাহিত্যে রচনার জন্য সেগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জীবনোত্তর কোনো সাহিত্যের উপজীব্য নয়।"[11]

শ্রীপতির বৌ: কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে

তিমির দল যেভাবে শুরু হয়েছিল তাতে মনে হয় নি গল্পটির মাঝে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মতো দেখা দেবে শ্রীপতির'র বৌ আর তার হাত ধরে গল্পটি সাধারণ গ্রাম্য জীবনের গল্পের পাশাপাশি এক মহাজীবনের গল্পও হয়ে উঠবে। গল্পের সূচনায় শ্রীপতি'র বৌ অনুপস্থিত, নেই সে সমাপ্তি তল (সশরীরে)। মাঝে হঠাৎ আগমন ঘটেছে তার, তারপর সমগ্র গল্পের মধ্যাংশ জুড়ে তার অবস্থান, আবার হঠাৎ অন্তর্গমন, কিন্তু তবু গল্পের শেষাবধি তার শরীর অশরীরী অবস্থান ছিলো লক্ষ করার মতো হয়ে গেছে গ্রামমহিলাদের শুধু মনেই নয়, পাঠককুলের মনেও।

পরিচয় ও বোধন-পর্ব

পাড়ার শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের পুত্র শ্রীপতি'র স্ত্রী হল 'শ্রীপতির বৌ'। গল্পে শ্রীপতি'র তাকে নববধূকে ঘরে তোলার আহ্বানে রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ি'র ও কাছাকাছি দুতিনটি বাড়ির মেয়েদের স্বরা বরণ ও ঘরে তোলার মাধ্যমে গল্পে বোধন ঘটে 'শ্রীপতি'র বৌ' এর। "শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে নিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধবধবে ফর্সা গায়ের রং ও পরনের লাল সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে। সর্বোপরি মুখশ্রী-এমন ধরণের মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।"[12]

এইভাবে গল্পে বোধন-পর্ব সারা হল শ্রীপতি'র বৌ এর। এক স্বর্গীয় রূপ তার আগমন। আর এর দিয়েই সে ভোলাতে বিশ্বনিন্দুক ও সংকীর্ণমনা গ্রামের মেয়েমহলকে—"বিকেলে ও পাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—না দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি গিন্নী মুখোমুখিই ছিল, ...সে উদ্ভাসিত সুরে বলে উঠলো...চমৎকার, খুড়িমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভাল।"[13]

পাড়ার ধারণা পাড়ার প্রান্তি : তবু যেন পাড়ার মেয়েমহল কিছুতেই বাগ মানে না। তাদের...

ধারণা : "...বাসন মাজতে হলে ও হাত আর বেশিদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না-ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের..."[১৪]

প্রাপ্তি : " দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল"[১৫]

শ্রীগুণ : বৌ এর শ্রীগুণে পুলকিত হয়েছে শ্রীপতি'র সংসার। পারিপাট্য যে একটি বিরল সাংসারিক গুণ, তা ছিলো শ্রীপতির বৌ এর সহজাত। শান্তি'র কথায়_

"(শ্রীপতির বৌ) ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, শিকার, নেপাটিফুলের তোল বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে-শ্রীপতির বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোর বাস করে নি... ভারি ফিটফাট গোছালো বৌটি..."[১৬]

সাবলিলতা ও বিনয় : সাধারণ ও সাবলিলতা মানবজীবনে এক পরম গুণ। এত মহৎ গুণ ছিলো শ্রীপতি'র বৌ এর। পাশাপাশি ছিলো তার অন্তর বাহিরের বিনয়। কমলার কথায়..."সাধাসাবি শাড়ি সেমিজ পরে তা ছিল। (শ্রীপতি'র বৌ) তার খুব ফর্সা কাপড় চোপড়...ময়লা একেবারে দুচোখে; দেখতে পারে না..."[১৭]

কলানৈপুণ্য : শ্রীপতি'র বৌ গীত বাদ্য সঙ্গীত অভিনয়ে পটিয়সী.....

ক. এসরাজ বাজানো : "একটু পরে রায় গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে..."[১৮]

প্রতিক্রিয়া : "ঘাটে গিয়ে তিনি মধুসূদনের বউকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতি বাড়ী কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা (এসরাজ) বাজাচ্ছে শুনে এলাম। দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছা করে।"[১৯]

খ. গীত : ১. "শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলো।

রাণাজি, ম্যায় গিরিধর কে ঘর যাঁঊ
গিরিধর মহারা সাচো প্রিতম দেখত রূপ লুভাঁউ।"[২০]

২. "তারপর আর একখানা হিন্দী গান গাইলে(শ্রীপতি'র) বৌ..."[২১]

প্রতিক্রিয়া : ১. "রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মার মনে হলো এই মেয়েটিই অনেক কাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান শোনাচ্ছে।"[২২]

২. "..এঁরা অবিশ্যি কিছুই বুঝল না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।"[২৩]

গ. অভিনয় : কিন্নর দলের অভিনয়ে "শ্রীপতির বৌ অনুরাধা, রমা ভদ্র।"[২৪]

প্রতিক্রিয়া : "অভিনয় শেষ হলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ী চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়।"[২৫]

সেবাদর্শ : শ্রীপতি'র বৌ এর ছিলো সেবাদর্শে মতি। গল্পে দেখি, "পাশের বাড়িতে চক্কত্তি গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন,

শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন সে নিজের ছেলের বৌ।"[২৬]

ভক্তিপরায়ণতা : শ্রীপতির বৌ এর ছিলো এক খাঁটি ভক্তিভরা মন, যা তার ব্যবহারেই স্পষ্ট হয়েছে। মীরার ভজন গাওয়ার পর "(শ্রীপতির বৌ) গানিকার চোখে মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো..."[২৭]

আত্মপ্রচারে বিমুখ- নিরহঙ্কারী : বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী শ্রীপতির বৌ যে আত্মপ্রচারে বিমুখই নয়, নিরহঙ্কারীও বটে। তাই দেখা যায়...

১. এস্রাজ বাজানোয় দক্ষতা সত্ত্বেও বাজাতে পারে কী না, কমলার সেই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে, "...একটুখানি অমনি জানি ভাই..."[২৮]

২. শান্তি'র কাছে রমা দিদির গুণের পরিচয় যখন দেয় তখন বারবার তাকে বাধা দিয়েছে শ্রীপতির বৌ "রমা বল্লে-তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদি। দিদি অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে...শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে...নে, নে, যা অনেক কাজ বাকী, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে...রমা না থেমে বল্লে... আর খুব ভাল পাঠ করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে...একবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়ীতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা জানো আমাদের নায় জ্যাঠামশায়? শ্রীপতির বৌ বল্লে....আবার? রমা হেসে হেসে গেল।"[২৯]

শ্রীপতির বৌ ও গ্রাম্য মেয়েমহল : শ্রীপতি'র বৌ এর বিরাট প্রভাব পড়েছিলো গ্রাম্য মেয়েমহলে। আর তার ফলে শুভ পরিবর্তন আসে তাদের মননে মানসিকতায়। বিষয়টি একটু নিম্নোক্ত ভাবে বোঝানো যাক....

ক. পদ্ধতি

১. "পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ এনো লুচি-হালুয়া খেতে দেয় নি।"[৩০]

২. "তাহলে এখন বলি বাজাতে বল্লে বাজাবে।"[৩১]

৩. "এসরাজ বাজানোর মধ্য দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠল।"[৩২]

৪. "শ্রীপতির বৌয়ের আপন পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে।"[৩৩]

৫. "একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে ভাই শান্তি, এক কাজ করি আমাদের পাড়াতে থিয়েটার করি?"[৩৪] ইত্যাদি

খ. পর্বাবস্থা : গ্রামীণ মহিলামহল- সাংস্কৃতিক ও মানসিক দৈন্য

১.১. "মজুমদার বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে মজলিশ হয়।"[৩৫]

২.১. "শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসি মুখে বল্লে -ভেতরে তাহলে অনেকখানি কথা আছে।"[৩৬]

৩.১. "চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন-আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে নাকি মাস্টার?"[৩৭] ইত্যাদি।

ঘ.পরিবর্তিত রূপঃ গ্রামীণ মহিলামহল-সাংস্কৃতিক ও মানসিক উত্তরণ

১.২. "অভিনয় শেষ হলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ী চলে গেল না।"[৩৮]

২.২. "শান্তির বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে বল্লে–তোমরা কারো ভাল দেখতে পার না বাপু। কেন ও সব বলবে, কজন ভদ্দরঘরে মেয়ের সম্বন্ধে?"[৩৯]

৩.২. "(চক্কত্তি গিন্নী)–এসো, এসো মা আমার এসো। তেল মালিশ আবার কেন মা?"[৪০] ইত্যাদি।

আসলে সংকীর্ণদের ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিয়ে তাদের আত্মিক তথা মানসিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজ (১৯১৬), তাই দেখিয়েছেন। গ্রামবাসীদের সংকীর্ণতার ক্ষুব্ধ রমেশকে তাই বিশ্বেশ্বরী বলেছেন, "...বরং আমি বলি তোরই এখনো থাকা সবচেয়ে দরকার।...রমেশ বল দেখি তোর রাগের যোগ্য এখানে আছে কি?"[৪১]

সুধী চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয় বলেছেন, "শ্রীপতির বৌ'র (কিন্নর দল), সে কয়েকমাসের জন্য বদ্ধ অন্ধকার গ্রামজীবনে একটুকরো স্বর্গের প্রতিষ্ঠা সুরুচি ও আত্মীয়তা দিয়ে। মৃত্যু এসে শেষ স্বর্গপ্রদীপকে নিভিয়ে দিয়েছে, গ্রাম আবার ফিরে গিয়েছে তার বদ্ধ নিরানন্দ অন্ধকার বিবরে। কিন্তু এ তো আর পুরানো সেই গ্রাম নয়, এ যে স্বর্গের সব পেয়েছে ইতিমধ্যে সে স্বাদ ভোলবার নয়, নতুন করে রচনার সাধ্যও নেই।"[৪২]

শ্রীপতির বৌ এর কিন্নর দল গল্পে হঠাৎ আগমন ঘটেছে, আবার ঘটেছে হঠাৎ নিষ্ক্রমণও। শ্রীপতির বৌ অতিথির তারাপদ ও গল্প হলেও সত্যির সমগোত্রীয়। তাই দেখি_

"কোথা থেকে দুদিনের জন্য এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকারণ কুটিল ভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, এই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেত"।[৪৩]

শ্রীপতির বৌ এর স্বরূপ : গল্পেই আমরা খুঁজে পাই শ্রীপতির বৌ এর প্রকৃত স্বরূপ বৈশিষ্ট্যকে। আমরা জানতে পারি যে... "শ্রীপতির বৌ প্রভাবশালিনী গায়িকা, সত্যিকারের আর্টিস্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েছে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে।"[৪৪]

নামহীন : গল্পের নামের প্রবল দাবীদার : গল্পে শ্রীপতি'র বৌ এর নামগোত্র কিছু নেই। কেন? আসলে নাম নির্দিষ্ট ব্যক্তি'র প্রতি আমাদের মনকে কেন্দ্রীভূত করে। নামহীন ব্যক্তিত্বখড়ো হয়ে ওঠে তার গুণও কার্যাবলীই তখন হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি'র পরিচয়। মানুষ দোষেগুণে মেশানো হলেও গল্পকার কিন্তু সকল ঐহিক গুণ দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন শ্রীপতির বৌকে, যার মধ্যে আপাত কোন দোষ নেই। হয়তো গল্পকারের অতি প্রায় ছিলো অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় এক মহিয়সী নারী চরিত্র সৃজন। সম্ভবত তাই তার এই নামহীনতা, যা নিয়েই যে নিয়েই সে গল্পের নামটিরও প্রবল দাবীদার হয়ে ওঠে। গল্পের নাম যদি কিন্নর দল না হয়েসরাসরি শ্রীপতির বৌ বা শ্রীপতির বৌ কেন্দ্রিক কোন নাম হত, তাহলেও হয়তো তাতে গল্পটির শিল্পগুণ বা সাহিত্যগুণের কোণ হানি হত না।

সমাপ্তি : শ্রীপতি'র বৌ ও গল্পের : শ্রীপতির বৌ এর জীবনের সমাপ্তি'র মধ্য দিয়ে একপ্রকার গল্পটির ও সমাপ্তি ঘটেছে... "শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।"[৬৪] মানবজীবনের যাবতীয় সকল গুণ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বলেই হয়তো শ্রীপতির বৌয়ের মরণ হতে পারে না, হয়তো এই কারণেই যে তারা যুগে যুগে অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেয় দিয়েছে ও দেবেও। আর তাই গল্পের শেষের দিকে দেখা যায়," ...অন্নরূপের জন্য শক্তির মনে হলে...যে বৌদিদি মরে নি..."[৬৫]

নামকরণ : জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল

ব্যক্তি সৃজন বা রচনা যে কোন কিছুর ক্ষেত্রেই নাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যে তো নামকরণে আলাদা গুরুত্ব আছেই। রচনার নাম সাহিত্যিকদের অভিষ্ট, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনার বক্তব্য বিষয়কে আভাসিত করে।

কিন্নর দল : আভিধানিক অর্থ : বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের এক অতি উল্লেখযোগ্য গল্প কিন্নর দল। অভিধানে 'কিন্নর' শব্দের অর্থ পাই "কিন্নর—বি: অশ্বের ন্যায় মুখ এবং মনুষ্যের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দেবালোকের গায়কজাতি। সং কিম নর বি (স্ত্রী) কিন্নরী"[৬৬] দল বি: পল্লব পাতা(বিল্বদল), পাপড়ি(শতদল); খণ্ড সমূহ, পাল, সম্প্রদায় (দলবল)..."[৬৭]

কিন্নর দল : প্রেক্ষাপট : বিভূতিভূষণের কিন্নর দল গল্পে কিন্নর দলের গাঁয়ের মধ্যে আগমনের প্রেক্ষাপটটি এরকম..."একদিন শ্রীপতির বৌ আমাকে বল্লে ভাই শক্তি, একটা কাজ করবি, সরস্তিংপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নাচছে! আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে শুনতে? অথচ ওরা কখনো কিছু শোনে না আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতে ভিয়েটার করি।"[৬৮]

ঝিয়ের দল :

ক. গঠন : ঝিয়ের দল শ্রীপতির বৌ ও তার নিজের এবং তুতো ভাই বোনদের দ্বারা গঠিত।

খ. সদস্য-সদস্যা : রমা, সতী, পিনু (এরা ৩জন শ্রীপতির বৌ সহোদের সহোদরা); পিন্টু তারা এবং স্বয়ং শ্রীপতির বৌ।

গ. নামকরণ : দলটি নামকরণ করেছেন শ্রীপতির বৌ এর জ্যাঠামশায় ("জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন ঝিয়ের দল"[৩০] শ্রীপতির বৌ)

ঘ. অভিনীত নাটকের রচয়িতা : শ্রীপতি'র বৌ এর জ্যাঠামশায়।

ঙ. অভিনীত নাটকের বিষয়বস্তু : এক ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী।

চ. অভিনয়ের দিন : মহাষ্টমী (সন্ধ্যা-রাত)

নামকরণের সার্থকতা : ঝিয়ের দল গল্পটির নামকরণের সার্থকতা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তুলে ধরা যাক..

গল্প নামের সার্থকতা :

ক. ব্যক্তি থেকে সমষ্টির নেপথ্যে : "আরে বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গায়ের কীর্তন খেয়েই তো মানুষ"[৩১] ..."সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।"[৩২]

খ. গ্রাম্যজীবনে চমক ও সাংস্কৃতিক মনন তৈরী : " অভিনয় শেষ হলো তখন রাত প্রায় এগারোটা গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না"।[৩৩]

গ. গ্রামীণ ঐক্যের নেপথ্যে : "সেই জন্যে সকলে বল্লে -বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে।

শান্তি বল্লে-বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার...

শ্রীপতির বৌ গাহিলে রমা এসরাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাহিলে।"[৩৪]

ঘ. নতুন জীবনের আস্বাদ : গ্রামীণ মেয়েমহলের নতুন ও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনের আস্বাদ গ্রহন শেখানোর যে পথ ও প্রক্রিয়া শ্রীপতি'র বৌ এর দ্বারা সূচনা হয়েছিলো, তারই চরম পরিণতি ঘটেছে ঝিয়ের দলের হাত ধরেই। পাশাপাশি সে ও এই ঝিয়ের দলেরই অন্যতম প্রতিনিধি।

ঙ. বিস্ময়তার সৃষ্টি : গল্পের শুরুতে ঝিয়ের দলের অস্তিত্ব দেখা না গেলেও গল্পের মাঝে যে দলটির অস্তিত্ব ও কার্যাবলীর পরিচয় দেখা যায়, তা গল্পে একটি বিস্ময়তা তৈরী করেছে ও যে সুখ এই দলটি বেঁধে দিয়েছে, সেটি গল্পের শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে।

দল নামের সার্থকতা :

১. কুশীলবদের দৈহিক সৌন্দর্য :

১.১. শ্রীপতি'র বৌ "আহা বৌ তো না, যেন পিত্তিমে..."[৫৫]

১.২. শ্রীপতি'র বৌ এর ভাইবোন "পাড়ার সবাই রূপ দেখে অবাক। এদের বাড়ীতে এমন চেহারার ছেলে মেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না..." [৫৬]

২. কলানৈপুণ্য : "সতী, রমা, পিন্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, কি চমৎকার রপ্তিয়েছে ওদের!... অভিনয় শেষ হলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ী চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়।"[৫৭]

কিন্নর দলের ভাঙন : কিন্তু কিন্নর দল শেষ পর্যন্ত ভাঙতে শুরু করেছে,

ক. অগ্রহায়ণ মাসের দিকে শ্রীপতির বৌ এর বাড়ী থেকে আসা চিঠি মারফৎ জানা গেল রমা হঠাৎ মারা গেছে।

খ. ফাল্গুন মাসের দিকে বসন্ত রোগে মারা যায় পিন্টু।

গ. শ্রীপতির বৌ আষাঢ়ের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়।

নামকরণের সার্থকতা: শ্রীপতি'র বৌ-কিন্নর দল এর সার্থকতা :

গল্পটির নামকরণ 'কিন্নর দল' সার্থক ...এটা উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলাই যায়। আর একটি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উত্থাপন করা জরুরি। গল্পটির নামকরণ যদি শ্রীপতি'র বৌ বা শ্রীপতি'র বৌ কেন্দ্রিক হ'ত তাহলে গল্পটির শিল্পগুণ ও সাহিত্যগুণ বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। তবে সেক্ষেত্রে 'কিন্নর দলই' কিন্তু নেপথ্যে থেকে যেত। কারণ, শ্রীপতি'র বৌ সেই কিন্নর দলেরই একজন যার মৃত্যু সংবাদ।

১. "গ্রামের অন্য অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক প্রকাশ এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি।"[৫৮]

২. "রায় দিদি, চক্কত্তি গিন্নী, শান্তির মা, মন্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।"[৫৯]

ঐ কিন্নর দলেরই সদস্যা শ্রীপতির বৌ...

"কোথা থেকে দু দিনের জন্য এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অন্তঃকরণ কি ভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, এই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো।"[৬০]

আসলে কিন্নর দল—তাদের গুণ, কার্যকারিতা ইত্যাদি নিয়ে গল্পের মধ্য থেকে শেষবধি হয়ে গেছে কান্নার ছায়ায়। তাই শান্তির'র মনে হয়. "যেন বৌদিদি মরে নি, কিন্নরের দল ভেঙে যায় নি, সব বজায় আছে।"[৬১] মনে প্রাণে ওরাও যেন কিন্নর দলেরই একজন হয়ে উঠেছে, যে দল তাদের শিখিয়েছে সংস্কৃতিবোধ, স্বার্থশূন্যতা, সৌজন্যতা—এনে দিয়েছে নতুন জীবনের আহ্বান। আর এখানেই গল্পের নামটি নতুন ভাবে সার্থকতা পায়।

১. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২০১৫ প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ১৩২
২. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ২০০৬-০৭ মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪১৬
৩. ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-১৮ এবং ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা-১৩, অধ্যাপক তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী, ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ২২৯
৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্নর দল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪০৬(বঙ্গাব্দ) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৯
৫. তদেব, পৃ. ৯
৬. তদেব, পৃ. ৯
৭. তদেব, পৃ. ৯
৮. তদেব, পৃ. ১০
৯. তদেব, পৃ. ১০-১১
১০. তদেব, পৃ. ১১
১১. 'ভূমিকা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪০৬(বঙ্গাব্দ), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩-৪
১২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্নর দল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪০৬(বঙ্গাব্দ) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১২
১৩. তদেব, পৃ. ১২
১৪. তদেব, পৃ. ১৩
১৫. তদেব, পৃ. ১৩
১৬. তদেব, পৃ. ১৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৩
১৮. তদেব, পৃ. ১৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৪
২০. তদেব, পৃ. ১৫
২১. তদেব, পৃ. ১৫
২২. তদেব, পৃ. ১৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৫
২৪. তদেব, পৃ. ১৯
২৫. তদেব, পৃ. ১৯
২৬. তদেব, পৃ. ১৬
২৭. তদেব, পৃ. ১৫
২৮. তদেব, পৃ. ১৪
২৯. তদেব, পৃ. ১৮
৩০. তদেব, পৃ. ১৪
৩১. তদেব, পৃ. ১৫

৩২. তদেব, পৃ. ১৫
৩৩. তদেব, পৃ. ১৬
৩৪. তদেব, পৃ. ১৭
৩৫. তদেব, পৃ. ৯
৩৬. তদেব, পৃ. ১০
৩৭. তদেব, পৃ. ১১
৩৮. তদেব, পৃ. ১২
৩৯. তদেব, পৃ. ১৩
৪০. তদেব, পৃ. ১৬
৪১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পল্লীসমাজ, ১৩৯৭ (বঙ্গাব্দ), বর্ণনা সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ ৪০
৪২. চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিভূতিভূষণ, ১৩৬৬(বঙ্গাব্দ) বিশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৭১
৪৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্নর দল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪০৬(বঙ্গাব্দ) প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২১
৪৪. তদেব, পৃ. ২০
৪৫. তদেব, পৃ. ২১
৪৬. তদেব, পৃ. ২৩
৪৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস(সংকলক), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, ১৯৭৫, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা পৃ.১৭৮
৪৮. তদেব, পৃ. ৪০৩
৪৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্নর দল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪০৬ (বঙ্গাব্দ) প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৭
৫০. তদেব, পৃ. ২০
৫১. তদেব, পৃ. ১০
৫২. তদেব, পৃ. ১৮-১৯
৫৩. তদেব, পৃ. ১৯
৫৪. তদেব, পৃ. ২০
৫৫. তদেব, পৃ. ১৪
৫৬. তদেব, পৃ. ১৮
৫৭. তদেব, পৃ. ১৯
৫৮. তদেব, পৃ. ২১
৫৯. তদেব, পৃ. ২১
৬০. তদেব, পৃ. ২১
৬১. তদেব, পৃ. ২৩

ISSN : 0976-9463

Volume 27 • Issue 4 • Number 47

TABU EKALAVYA

তবু একলব্য

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

সমাজ

সংস্কৃতি

সাহিত্য

ISSN 0976-9463

তবুএকলব্য

৪৭

বর্ষ ২৭ • সংখ্যা ৪
ক্রমিক ৪৭

Volume 27, Issue 4
Number 47

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research
Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী
রেফার্ড ও পিয়ার-রিভিউড পত্রিকা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য

সম্পাদনা ও সংকলন

ড. দেবারতি মল্লিক

ড. দীপঙ্কর মল্লিক

আমন্ত্রিত সম্পাদক

ড. লিপিকা সরকার

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

স্বাধীনতা-পরবর্তী ও বাংলা ছোটোগল্প : সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা

কুশল চ্যাটার্জী

সারসংক্ষেপ

'সাহিত্য সমাজের দর্পণ'। আর তাই বারবার সমাজের স্পন্দন সাহিত্যের বিস্তৃত পটে অনুভব করা যায়। সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে ধরা পড়েছে, বিষয়টি তাই আলোচনার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর ৩টি প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটোগল্প নির্বাচন করে আলোচনা করা যেতে পারে। মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তন্যদায়িনী' গল্পে সমাজের সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেছে যশোদা। স্তন্য দানকেই সে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। একদা একার্থে সে পরিপালন করলেও তার স্বামী অবস্থার পরিবর্তনে যশোদাকে পালন করতে অস্বীকার করে। কালক্রমে যশোদা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

সূচক শব্দ

প্রান্তিকতা, মহাশ্বেতা দেবীর জীবনদর্শন, গল্প শৈলী, নির্মাণের অভিনবত্ব।

মূল প্রবন্ধ

মতিন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কাল-ভুজঙ্গ' গল্পে তুলে ধরলেন এক প্রান্তিক পরিবারের কথা, যে পরিবার খরায়-ক্ষুধায় বিপর্যস্ত। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে মা সোনামণি বাধ্য হয় দুই কন্যার পাতে কৃমেশ তুলে দিতে। সমাজের তথাকথিত 'বাবু' শশী কীভাবে সোনামণির 'সোনার ধান্য' হরণ করতে প্রবৃত্ত হয় তা-ও এ গল্পে দেখিয়েছেন লেখক। তবে লেখক এখানেই থেমে থাকেননি। আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে বলীয়ান শশীর শাস্তিবিধানে কীভাবে সোনামণি প্রবৃত্ত হয়েছে, তা-ও বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'ইন্দর যাগ' গল্পেও বলেছেন এক গ্রামের কথা, যে গ্রামও খরার অভিশাপে অভিশাপগ্রস্ত। সাধারণের প্রতিনিধি একটু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী লখিন্দরকে কীভাবে সমাজের বিত্তশালী ও স্বার্থপর শ্রেণির প্রতিনিধি ভরত (ভৈরব) কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়, তা-ও তুলে ধরেছেন লেখক। তবে লেখক এই গল্পে বর্ণনা করেছেন সমাজের সাধারণ শ্রেণির মানুষদের ঐক্যবদ্ধতা ও নেতৃত্বগুণের বিষয়টি। বর্ণনা করেছেন আর্থিক বলে বলীয়ান স্বার্থপর সমাজপতিদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের সরব ও নীরব বিপ্লবের কথাও। সাহিত্য বরাবরই নিজের বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমাজকে ধারণ করে। তাছাড়া 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ'—কথাটি যেন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আর এই কথা

সত্যতো পায় বারবার, যখন দেখা যায় মানবসমাজের তাৎক্ষণিক সুখ, দুঃখ, দৈনন্দিন জীবন প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা, লোকাচার, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি বারবারই ধরা দিয়েছে। সময় একটি যুগ থেকে আর একটি যুগে পদার্পণ করে নিয়ে নিয়ে। নতুন কাল বয়ে আনে নতুন চিন্তা ভাবনা, নতুন জীবন-জীবিকা। পাশাপাশি ভাবনা, জীবন-জীবিকার কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু একই রয়ে যায়। হয়তো নতুন মোড়কে যায় পুরানোকেই। শুধু যুগ বদলায়, বদলায় মানুষের জীবন, জীবিকা, জীবন শৈলী। এমনই ধরা পড়ে সাহিত্যে।

বাংলা ছোটোগল্প আধুনিক যুগের ফসল। 'নিতান্তই সহজ সরল' হলেও 'কাননের ফুল' থাকলেও 'অন্তরে অতৃপ্তি' রেখে শেষ হয়ে না শেষ হওয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছোটোগল্প তার পরিসরে বারবার সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, জীবনযাত্রা তুলে ধরেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি বিশেষত বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, মননে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জীবন সাহিত্য নিজ-বক্ষে ধারণ করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকার কথা কীভাবে বাংলা সাহিত্যে ধরা পড়েছে, তা স্বাধীনতা-উত্তর ৩টি বাংলা ছোটোগল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করা যাক—স্তন্য দান কি জীবিকার মাধ্যম হতে পারে? যদি স্তন্যই হয় তাহলে পরোক্ষে জীবনধারণের উপায়, তাহলে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'স্তনদায়িনী' গল্পে সাহায্যে অভিনব জীবিকার কথা তুলে ধরেছেন—স্তন্যদান, যা স্বাধীনতার পূর্ববর্তীতে দেখা যায়নি, স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটোগল্পের ধারাতেও অভিনব (যদিও এর সাথে সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের কিছুটা ভাবসাদৃশ্য আছে)। গল্পে স্তন্যদায়িনীর ভূমিকায় দেখা যায় যশোদাকে। লেখিকা যশোদা সম্পর্কে জানান—

> জন্ম থেকেই সে (যশোদা) যেন কাঙালিচরণের বউ_নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার জীবন। অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশনাল মাদার।_যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।

'জীবিকা' বলতে যদি বোঝানো হয় 'জীবনধারণের জন্য গৃহীত পেশা বা বৃত্তি', তো যশোদার জীবিকার্থে মাতৃত্বকে মেনে নিতে সমস্যা হওয়ারই কথা। লেখিকা তবু নিজেই জানিয়েছেন 'যশোদা পেশায় জননী' এবং 'যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।' যশোদার স্বামী 'লোকে তাকে বলে নাড়া' স্বামী কাঙালিচরণ বাবুদের ছেলের স্টুডিবেকারে দুর্ঘটনায় পা হারিয়েও বাঁচার পথ পেয়েছিল। হালদারবাবু তাকে দোকান করে দেবেন বলে। হালদারবাবুর প্রয়াণের পরও নবীনের কথা শুনে ধর্মকে উপজীব্য করেও মানুষের বিশ্বাস ব্যবহার করে রোজগার করতে না চাইলে কাঙালির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। নইলে সমস্যা হবে বলে মায়ের দোকানের চাকরি সে আগেই ছেড়েছিল। জীবনধারণের তাগিদে যশোদা শরণাপন্ন হয় হালদারগিন্নীর। তার নাতিকে ঘটনাচক্রে তারই অনুরোধে যশোদাকে স্তন্যপান করাতে হয়। এরপর যশোদার সংসারের জন্যে "রাঁধুনি বামনি ছাড়-তরকারি দিয়ে ভাত দিয়ে এস।" যশোদা রোজগার করল এই ভাবে। স্তন্যই যেন যশোদার পরিচয়

হয়ে দাঁড়ায়, হয়ে দাঁড়ায় সংসারে জীবনধারণের মাধ্যম। কাঙালিচরণের—"দুপুর বেলায় সেটা ঘর পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্যভাবে জাগে এবং যশোদার পীঠ জুড়ে দিয়ে কাঙালচরণ ঘরে সে ঘুমিয়ে পড়ে।" অ্যাকসিডেন্টের দিনও—

দুপুর বেলায় ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালিচরণ মধুর সুখের কথা ভাবছিল এবং দুপুরভর ভাবের কথা ভেবে সে খাওয়াদুপ পাচ্ছিল। খাঁটি মেয়ে দিয়ে ঘরে তাকে কম খাটিয়ে দুপুর বেলাতেই আদরে দুপুরে সুখ মেলে একথা চিন্ত করে তার নিজেকে দুরন্ত পুরুষমানুষ মনে হচ্ছিল।

তবার যশোদাও নিজের স্তনে স্তন্যের জোগানে অবাক হয়ে হালদারগিন্নীকে বলে—"গোপাল হয়ে গিল, বয়স হল তিন বছর। এটা তখনো পেটে আসেনি। তাতেও দুধে যেন বান ডাকছে। থেকে শুরু করে যশোদা। হালদারবাড়ির মেজ ছেলে তার 'সন্তান-বিলাসী' স্ত্রীর 'ক্রমাগত গর্ভধারণ ও সৌন্দর্যের কম্বিনেশন কীভাবে করা যায়'—একথা সমস্যায় ভাবে। সে 'স্ত্রীর মুখে যশোদার গলেতে মা-ছেলের পরামর্শ। প্রাথমিক আপত্তির পর মা-ও বুঝলেন যে, 'প্রস্তাবটি লাভ টিকার', বলে—

বউরা এসেছে, বউরা মা হবে। মা হলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। যেহেতু যতদিন সন্তান, ততদিনই মা হবে, সেহেতু ক্রমাগত দুধ খাওয়ালে চেহারা বটিকাবে। তখন যদি ছেলেরা বাবুদের হয়, বা বাড়ির ঝিদের ওপর উৎপাত করে, গিন্নি কিছু বলতে পারবে না। ঘরে খাচ্ছে না বলে বাইরে যাচ্ছে, হক কথা। তাই যশোদা যদি বউদিদের দুধ-মা হয়, তাহলে নিত্য দিন, পুজোর পার্বণে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা দিলেই কাজ হবে।

যশোদা নতুন চাকরি পেয়ে 'মস্তিষ্ক পেল।' আর তাই—"নিজের স্তন দুটিকে বড় মহার্ঘ মনে হল। রাতে কাঙালিচরণ খুনশুটি করতে এলে সে বলল, 'দেখ! এখন এর জোরে সংসার চলে বুঝে শুনে ব্যবহার করবে।'" আর তাতে "কাঙালিচরণ সে রাতে গাঁইগুঁই করল বটে, কিছু দিনতে চাল-ডাল-তেল-আনাজের বহর দেখে তার মন থেকে গোপাল ভাবটি নিমেষে হয়ে গেল।" হালদারবাড়িতে নতুন যুগ প্রবেশ করে ধীরে ধীরে। বাড়ির এবার পৃথগন্ন হল। ছেলেরা আলাদা হল। হালদার গৃহিণীও স্বর্গে গেলেন। ছেলেরা যেহেতু বড়ো হয়েছে তাই বাড়িতে যশোদারও জবাব এল। সব কর্ম-স্থলেই কর্মজীবীদের কর্মজীবন শেষ হয়। যশোদাও এর ব্যতিক্রম নয়। বড় গিন্নী যশোদাকে সাফ জানিয়ে দেয়—

তোমার দুধে সবারে পালছ, নিত্য সিধা গেছে। হায় সন্তান দুধ ছাড়লে। তবুও খাঁটি বছর মা সিধা পাঠাইছে।...কিন্তু অহন তো আর পারলাম না। যদিও 'পাক-সাক' করে যশোদাকে সে 'ভাত' চালানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। অতঃপর যশোদা স্বামী নবুদেবের বাদুন কাঙালিচরণের আশ্রয় হলে, সে তাকে এখন ভরণ-পোষণে একপ্রকার অধিকার করে। নিজের বাড়ি ও হালদারবাড়িতে প্রয়োজন ফুরায় যশোদার। অগত্যা সে পেনশিয়ানের দাবি নিয়ে সেই হালদারগিন্নীর কাছে গিয়ে বলে, রাঁধব বাড়ব, মাইনে দেবে দিও, না দেবে দিও না। থেকা থাকতে দিতে হবে। জীবনশেষের শেষপর্যন্ত কর্মাক্ষেই কাজার হয়। কোনো এক রাত এগারোটায় একপ্রকার কি-হাজিরাতেই ইহকালের কর্মজীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অতীন্দ্রিয়-লোকে যাত্রা করে

সে। নিম্ন শহরের বা নিম্ন দুঃস্থ কোনো ধরনেরই সন্তানদের সে স্বাদ পায় না শেষ পর্যন্ত। স্বাধীনতা-উত্তর কালে অতীতের ভাবনা ও সংস্কারে এক জীবিকাধারিণী যশোদা। এখনও সন্তানের 'দুধ-মা' সে। এক দেহেই সে দেবকী ও যশোদা দুই-ই। স্বাধীনতা-উত্তর কালে অর্থনৈতিক চাপে, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার আধুনিক রূপ সবই এই গল্পে কার্যকারণে ফুটে উঠেছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জল-তৃষ্ণা' গল্পে এক প্রান্তিক পরিবারের চিত্র দেখা যায়। স্ত্রী সোনামণি আর দুই মেয়ে মনি ও বনিকে নিয়ে নিশির সংসার। বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হওয়ায় যেমন পূজা-পার্বণ না হওয়ায় ঢোল বাজানোর পেশা বন্ধ তার। পাশাপাশি অভাবের তাড়নায় পাঁচ কাঠার ওপর ঘর 'বাবু' শশী'র কাছে বাঁধা।

পরিবারের জন্য কুঁড়িখুঁড়িতে ক্ষুদকণা সোনামণিকে খেতে দিতে হয় সন্তানদের। তখন ক্ষুধা নিশির মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে। পিতা হয়েও—"বোধ হয় দুই মেয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে খাওয়া দেখেই নিশি আগুন হয়ে উঠেছিল। পেটে আগুন, পিঠে আগুন, সারা মাঠময় শুধু আগুন ছড়িয়ে আছে।"[১২] এমন এক সময়ের শিকার হতভাগ্য পিতা নিশি যে, কন্যাদের সামান্য ক্ষুদকণা খেতে দেখেও সে আগুন হয়ে ওঠে। পাশাপাশি মনি ও বনিও এমন এক পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার, যেখানে ক্ষুদকণাও তাদের 'তাকিয়ে তাকিয়ে' খেতে হয়। ক্ষুধা, জীবনের প্রধান শত্রু—

> নিশির ইচ্ছা হল, ঘরে ঢুকে খিদের জ্বালায় ঢোলটা কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমে যায়। মেয়ে দুটো কুঁড় খেয়ে বসে আছে। সোনামণি কাঠের হাতা নিয়ে বসে রয়েছে, ওরা পাতেরটুকু শেষ করলে হাঁড়িতে যা কিছু চেঁছে দেবে। নিশির ঢোল নিয়ে ছুটতে ইচ্ছা হল মাঠে, তারপর ক্ষেতে ক্ষেতে ঈশ্বর ঢোল তুলে, জোরে ছুটিয়ে, মাঠে ময়দানে আগুন ছড়িয়া দিতে ইচ্ছা হল। পরে আবার সোনামণির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা হল।[১৩]

অজন্মা-খরায় প্রান্তিক মানুষদের প্রাণধারণের উপায় কী সে ক্ষুদকণার অধিকারিণী অন্নপূর্ণারূপী স্ত্রীর কাছে ভিখারি শিবের মতো ক্ষুদকণা ভিক্ষে চায়। শেষে নিশি সোনামণিকে যেন নেশা ধরার মতন নিয়ে বলে—"যাবি তু, চলি যাব তবে সোনার ধান তুলে নিব। শশী বাবমাঠের ধান ছড়িয়েছে। যাবি তু! তু আর আমি দু-পাখিতে সারারাত ঠুকরে ঠুকরে ধান তুলে নেব।"[১৪] অতঃপর চারজন চলে ধান-ছড়ানো জমিতে। শশীর কড়া পাহারা চলছে সেখানে—

> ওরা চার চারটি পাখির মতো খুঁটে খুঁটে যেন খুব সতর্কপণে আলগোছে তুলে আনছে ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচ-সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে।[১৫]

কিন্তু শশী টের পেয়ে যায়। স্ত্রীর কথা না ভেবে নিশি ছুটতে থাকে। বাবার পেছন পেছন মেয়েরাও। শশী এসে দাঁড়ায়। আঁচলে ধানসুদ্ধ জল-কাদায় সোনামণির শরীর ভারী। শশীর সোনামণির ওপর বরাবরই কুনজর ছিল। একদা শশী'র হাতে কামড় বসিয়ে সে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু আজ। শশী তাড়া করে, সোনামণি ছোটে—

> কে যায় রে। থাম, থাম। বাবাড়ু চোর পড়েছে। শশী এই বলে হাঁক ছাড়ল। তারপর শশী চোর ধরার মতো অন্ধকারে সোনামণির পেছন পেছন ছুটতে থাকল। সোনামণি আলের ছুটে অন্ধকারে ছুটছে।...সেই অন্ধকারে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দু-হাত উপরে তুলে জমিন ... শশী চিৎকার করে উঠল, তুমি সোনামণি, তুমি জান না আমি শশী, আমি কালশশী। তোমায় আমি খাঁচায় ফেলেছি রে সোনামণি।[১৬]

শশীর হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পেলেও আবারও তার আয়ত্তে এসে পড়ে সোনামণি। বিলাপ করতে করতে সে ভগ্নীকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, "হাঁ রে দিদি, তুই আমারে ফেলে চলে পালিয়েছে। হাঁ রে দিদি, আমার সোনার দানা চুরি যায় রে।"[১৭] শশী 'কালো' নাগ (কাল) হয়ে আসে সোনামণির কাছে। আর এই— 'কাল-শশী'র হাত থেকে নিজের 'সোনার দানা' রক্ষা করতে সোনামণিও কাল-ভুজঙ্গিনীর মতো মরণ-কামড় বসায় ভিটেদার শশীর গলায়। তবে এবার গলায়, যে কাল-ভুজঙ্গ শান্তি-নিকেতনে নিশ্চয়, সেই অনন্ত কাল-ভুজঙ্গিনীর দংশনে হল ভূপতিত—

> সোনামণি বলল, সোনার দানা আমার। তু (শশী) আমার সোনার দানা চুরি করে নিছিস। বলেই হঠ করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল, আলোমানুষের ছা শশী মুরগির মতো উঠে দাঁড়াল, দু-তিনটে বড় লম্ফ দিল কামড় ছুটিয়ে, পাগলের মতো দু-হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক অতিকায় ভুজঙ্গের মতো লুটিয়ে পড়ল। সোনামণি, সমানে এক প্রাণপণি শশীর মতো দংশনে, যে আকাশের ঘণ্টা বাজায়, প্রাণ হরণ করে চলে গেল।[১৮]

প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কাল-ভুজঙ্গ' গল্পে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের, যাদের প্রতিনিধি দুখী, সোনামণি, খুকি, বকি, জীবনসংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রোষের সাথে সাথে যাদের সমাজের ওপরতলার মানুষদেরও লোভ-লালসার শিকার হতে হয়। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রান্তিক মানুষদের জীবনে যে কী অবর্ণনীয় অভিশাপ হয়ে আসে, তা এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নিঃসহায় প্রান্তিকেরা কীভাবে ক্ষমতাশালীদের গ্রাসে পতিত হয়, লেখক তা-ও দেখিয়েছেন। তবে এখানেই লেখক থেমে থাকেননি। তিনি প্রান্তিক মানুষদের প্রতিরোধের কথাও বলেছেন। ধনবান ও মহাশক্তিধর শশীর বিরুদ্ধে সোনামণি যে শুধু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তা-ই নয়, প্রাণহরণ করে পাপী ও তার পাপের নাশও ঘটিয়েছে। এখানেই গল্পটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। ভগীরথ মিশ্রের 'ইন্দর বাগ' গল্পেও খরার প্রকোপের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গোটা গ্রাম এর গ্রাসে পতিত। গল্পের সূচনায় গ্রামের মানুষের ঝাড়ফুঁক-তুকতাক ও নানাবিধ বিদ্যা-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে। গল্পটির অনেকটা, বরং বলা ভালো পুরোটাই জুড়ে আছে এই লোকবিশ্বাস। গল্পে পাই—

> লখিন্দরের গাঁয়ের মানুষকে শুধালে তারা আধা-অবিশ্বাসে হাসে। এদেশের সব অনাই গুরুবুদ্ধি ঘটিয়া।...তবে আছে পৃথিবীতে বিদ্যা আছে। ডোমবিদ্যা, কুহকবিদ্যা, মধুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, কতশত কতই-না বিদ্যা আছে এ দুনিয়ায়। সঠিক থানে আসল গুরুর কাছে পাঠ নিলে আর ঠিকঠাক সাধন করলে বিদ্যা ফলে বইকি।[১৯]

খরার প্রকোপে শুকিয়ে যাওয়া গ্রামকে লখিন্দর পথ দেখায়। উপায় খুঁজলে সে বলে, "উপায় আছে ঘটিয়া। মহিনদের হাতেও সব আছে।"[২০] লখিন্দরের বহুমুখী ক্ষমতা আছে তা তার গ্রামবাসী বিশ্বাস করে। সে বাণ ধরতে পারে। পাশাপাশি "সে নাকি দৃষ্টি ফেললে মাত্রই টসটসে গাছের গুটি, কচি ডাব শুকিয়ে আধা হয়ে যায়। পানের ডাব্বার থেকে বাণ মেরে সে নাকি সুখ পাত্রের ভর কাইতিকে মুখে রক্ত তুলে মেরেছে।...দুনিয়ায় হেন কুহক নাই যা উ জানে না।"[২১] লখিন্দর সমাজের সাধারণ সদস্য। আর এই সব সাধারণকে অসাধারণ মানুষের উদ্দেশে সমাজের 'গুণমান' ব্যক্তিরা ব্যবহার করেন, তা-ও গল্পে তুলে ধরা হয়েছে—

ফুলডাঙরের ভরত গাঙ্গুলি পুরানো বাড়ি। তিন তিনটে ধানের গোলা। বাঁশের ঝাড়, আম-কুলগাছের বাগান। হুঁকা রেখেই ...এলাকার লোকজন ওকে ভয়ভক্তি করে চিরকাল। তবে দিন, দিনকালের যা বদলাচ্ছে রূপ। মানুষ যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে দিন দিন। ছোটজাতের ... এই দুই পরিবর্তনগুলি ভরত গাঙ্গুলিকে ভারি ভাবায়। সেই কারণে দুনিয়ায় এই দুই পরিবর্তনগুলি ভরত গাঙ্গুলিকে ভারি ভাবায়। সেই কারণেই একদিন দুনিয়ার লখিন্দরকে চাকরিটা দিয়েছিলেন ভরত গাঙ্গুলি। বইতো হল যে যে। বাড়ি বাড়ির পর আর এখানে কাজ নিয়েছে করে লাভ কী? সাধন-ভজনের জন্য একটা বাড়ি তো যে চাই। আমার বাড়ির লাগোয়া ভিটেটাতেই থাকো না তুমি। বাকি তো পড়েই আছে। ঘর না হয় বানিয়ে দিচ্ছি। সাধন-ভজন করো নিরানন্দে।"

এখানে ঘর না হয় বানিয়ে দিচ্ছি। ভরত গাঙ্গুলি যার আশ্রিত, বলতে গেলে, হাতের মুঠোয়, তাকে হাসল উত্তেশ। "এমন শক্তিমান মানুষটি যার আশ্রিত, বলতে গেলে, হাতের মুঠোয়, তাকে খাতির করতেই হয়।" কিন্তু সাধারণ মানুষ উচ্চকোটির আশ্রয়ে থাকলে যে দিতে করতে চাকরি করতেই হয়। যা না হলে জুটবে তিরস্কার, নয়তো অপমান। লখিন্দরের হালে মনোরঞ্জন করতেই হবে।

ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি—

গাঙ্গুলির ওর ওপর অবস্থার হুকুম করে। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয় এলেই লখিন্দরের ডাক পড়ে। সাপের খেলা দেখাতে হয়। হরেক কিসিমের আজব আজব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। ডাকিনি-যোগিনী বানিয়ে দিতে হয় বিনা পয়সায়। গাঙ্গুলির বলাটা ছোটো—ঠিক কী যে নাম-যে প্রাণী এসে হুকুম করে। কেয়া বলা কারবার বিনাটা ওকে শিখিয়ে দিতেই হবে।"

অতীতচারিতা মানুষের এক স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। অনেকেই "আগে কী সুন্দর দিন ছিল" বলে হা-হুতাশ করে। তখন "খুবুল্লিরা। তাদের পুরোনো দিনের রাইটিয়ম"-এর মতো। যখন খরার গ্রাস জেলায়, তখন "খুবুল্লিরা। তাদের পুরোনো দিনের বর্ষা-বাদলের গল্প জুড়ে দেয় করে।" সমাজের শিক্ষিত ছেলেরা যখন বৃষ্টির জন্যে যুদ্ধে ব্যস্ত, অবদান উল্লেখ করে জঙ্গল কাটার জন্যে ভর্ৎসনা করে জনসাধারণকে, তখন শিক্ষিত ও অবিবেচক "বড় ইস্কুলের মাস্টারবাবু কাঠের গুজন বুকে নিয়ে জলের নামে কেনেন।" আর নির্লিপ্ত কণ্ঠে সুবিধাবাদীদের মতো বলেন, "এই সরকার আছে বলেই বেঁচে আছিস তেইনা-পুইনা নিয়ে। উই সরকার থাইকলো গাছ কাটাটা থামাতো।"

খরার হাত থেকে গ্রামকে বাঁচাতে হবে। তাই ভৈরব (ভরত) গাঙ্গুলির বাড়ির উঠোনে সোনা আনার মিটিং বসে। কারণ এ সমস্যা সর্বাধিক। 'ফুলডাঙরের তিন পাড়া মিলে উনবাটি ঘর বামুন-কায়েত, তেলি, বাগদি-বাউরি।' আর শোনা যায় লখিন্দরের আশ্বাস-বাণী, "সে কোন যক্ষের পেটেতে ঢুকে বইতেছে জলডমর। সে বিদ্যার প্রয়োগে চতুর্দিকে বাণ ছুইরেছে। শুধু হবেক মহাদেবের সাথে ইন্দ্র দেবের লড়াই। লড়াইয়ে সুধাদেব মেঘেতে মুখ লুকাবেন অতঃপরে। আকাশময় গুড়ুম উঠিবেক মেঘ। শুধু হবেক অবিরাম বর্ষণ। চরাচর ভাইসো যাবেক।...সোনার বাত্রা বন ফইলবেক খেতে।" নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস ছিল তার। তার সাথে—

> সেই কবে কোন ছেলেবেলায় বরদাঁড়ির কোন এক অজ গাঁয়ে রামায়ণ গানের আসরে ইন্দ্রযজ্ঞের কাহিনি শুনেছিল সে। চতুর্দশ বছরের অনাবৃষ্টি চলছে।...যজ্ঞ শুরু করেছেন রাজা। ইন্দ্রযজ্ঞ। যজ্ঞের শেষ দিনে চরাচর কাঁপিয়ে বৃষ্টি।"

এ সমস্যা সকলের। তাই যজ্ঞ করে বৃষ্টি নামানোর যজ্ঞানুষ্ঠানের খরচ পাঁচ হাজার টাকার জোগান কমবেশি করে সকলকেই দিতে হবে। কিন্তু খরার সাথে লড়তে থাকা সহায়-সম্বলহীন

[illegible] যে বার বছরে অজন্ম—"মানুষগুলো পিঠিপিটিয়ে মারলো। রাই ভোরে। মাটিতে [illegible] কেউ কেউ অনর্গল কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে উঠে পড়ে। ধাই, ধাই হল। [illegible] ঢাকা তো দূরের কথা। এখন চল্লিশটি অন্ততঃ পেলে স্বপ্ন।" আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠুর [illegible] কাছে আত্মসমর্পণ। সাধারণের প্রতিনিধি লখিন্দর। শিক্ষানবীশ গাঙ্গুলির পা জড়িয়ে ধরে [illegible] করে সে বলে—"আমাদের মেয়েটা যদি বাঁচে, তেনে [illegible] যে উকিল [illegible] তুলনায় টাকাটা লাগনা। আপনি বিচারক মানুষ, বিচার করুন।" তার অর্থবান শিক্ষানবীশ [illegible] প্রতিনিধি গাঙ্গুলি 'সামাজ্যবাদের দুষ্টি কবলের মধ্য'-এর মতো [illegible] লখিন্দরকে বলেন—"বেশি উপকরণ দিই তেবে শুধু মোর জমিনের উপর [illegible] পারবি? ধনা করার নয়। শুধু মোর জমিনের উপর।"

[illegible] সামর্থ্য থাকলেও এই শ্রেণির মানুষদের সহায়-সম্বলহীনদের জন্যে নিঃস্বার্থে কিছু [illegible] মানসিক সামর্থ্য থাকে না। তাই সাধারণের প্রতিনিধি তাঁর মুখের ওপরেই সদর্পে বোঝায়—"উটি কইরেছো লাবে দুজুর, আমার এ বিদ্যা কারো গুলামি নাই কইরেছে।" এই [illegible] গাঙ্গুলির পরিবারের ওপর কখনই করেনি লখিন্দর। তবে আজ এই প্রতিবাদ কেন? একদিকে [illegible] নতুন পরিস্থিতি, অন্যদিকে গাঙ্গুলির নিষ্ঠুর লালসার বেয়াদ্ব প্রকাশ—এই দুই কি লখিন্দরের অন্তরের ঘৃণার লাভা-উদ্গীরণপথকে মুক্তি দিয়েছে? শেষে ক্ষমতার [illegible] গাঙ্গুলিকে গণতন্ত্রের প্রাথমিক পাঠ মনে করিয়ে দিয়ে বলে—"তুমি [illegible] গোলাপ ফুল। একজনায় বাগিচায় ফুইটেবেক। তার সুবাস পাবেক বিশ্ব চরাচর।" [illegible] গাঙ্গুলির আশ্রয় ছাড়তে হয় লখিন্দরকে। তাঁর জমি পার হয়ে যাওয়ার সময়—

> আচমকা দাঁড়িয়ে গেল লখিন্দর।...প্রণাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করতে লাগল সারা জমিন। মদন বাউরি রক্ত চোখে দেখছিলো ওস্তাদের কাণ্ড-কারখানা। তাই দেখে একসময় খল খল করে হেসে উঠল লখিন্দর। দাঁতে দাঁত চেপে পিশাচের গলায় বলল, শালা গাঙ্গুলি, কেবল নিজের জমিনে দিষ্টি খরাইবার চেয়েছিল। কবাই নিলাম দিষ্টি। শালা বমন হনতে ইবার [illegible] হউক।"

সাধারণের প্রতিনিধি অর্থবানের আশ্রয় ছেড়ে সাধারণের জন্যে সাধারণের মাঝেই ফিরে আসে। ফিরে আসে নায়ক হয়ে। সাধারণও তাদের 'উস্তাদ'কে গ্রহণ করে সর্বান্তঃকরণে। কারণ, [illegible] এই 'উস্তাদ'ই তাদের নতুন দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। তাদের বিশ্বাস এই 'উস্তাদ'ই পারবে [illegible] বুকে শ্রাবণের জলোচ্ছ্বাস আনতে—

> ঠিক সেই মুহূর্তে, জেগে-ওঠে কালো কালো মানুষের ছায়া ছায়া মূর্তি। গাঁয়ের পাড়গাছালির আঁধার ফুঁড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তারা।...কালো বাউরি এসে লখিন্দরের পাশটিতে দাঁড়ায়। উদাত্ত ওঠা গলায় বলে, 'গাঁয়ে ফিরে চল উস্তাদ।
>
> মোদের ভিটায় ঘর বেঁইধ্যে দুবো তুমার। মোদের সর্বস্ব দিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিখ মেঁইগ্যে, দরকার হইলো নিজেদার বিক্রি কইর‍্যে তুমার ইন্দর যাগের টাকা তুইলা দিব মোরা। তুমি ফিইরে চল।"

গ্রামের সকলের যখন একই দুরাবস্থা, তখন কোন্ দুয়ারে তারা ভিক্ষা চাইবে? নিজেদের [illegible] বিক্রিই করবে, তবে এই যজ্ঞের প্রয়োজন কীসের? এই যজ্ঞ তাদের কাছে আর নিজেদের [illegible] এ তাদের নেতার স্বপ্ন ('তুমার ইন্দর যাগের...')। আর ঠিক এই সময়েই দেখা যায়—"সেই

প্রতিবেশী ভাবনায় ধীরে ধীরে জমতে থাকে ক্ষোভ। একসময়ে দুচোখ ভাসিয়ে অঝোরে নেমে আসে বৃষ্টি। অবিরল ধারায়। শবরের চোখে যে বৃষ্টি। এখনও থামে না। জীবন মিত্র 'ঈশ্বর ধান' গল্পে এমন এক গ্রামের চিত্র এঁকেছেন, যে গ্রামের জনজীবন খরায় বিধ্বস্ত। এই গ্রামের অধিবাসীরা বৃষ্টি কামনা করে। তাই বৃষ্টি গ্রামের একান্ত প্রয়োজনের। কিন্তু এর অন্তরালে সমাজের উচ্চ ও নিম্নবিত্তের মধ্যে মৌল প্রভেদ, উচ্চবর্গের স্বার্থান্ধ হৃদয়হীনতা— দেখিয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন আত্মসর্বস্ব উচ্চবিত্তের আত্মকেন্দ্রিক আচরণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও ঘৃণা। দেখিয়েছেন নিম্নবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও মানবিকতা। এখানেই গল্প অনন্য হয়ে ওঠে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলকান্তি দাশ সম্পাদিত : মহাশ্বেতা দেবীর 'ভূমিদাসী', "দুই বাংলার গ্রামের গল্প", দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ ৯
২. তদেব, পৃ ১০
৩. তদেব, পৃ ১০
৪. তদেব, পৃ ১৬
৫. তদেব, পৃ ১৬
৬. তদেব, পৃ ১৬
৭. তদেব, পৃ ১৬-১৭
৮. তদেব, পৃ ২০
৯. তদেব, পৃ ২৫
১০. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কাল-ভুজঙ্গ', অরুণকুমার শিকদার (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা গল্প সংকলন' তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পৃ ১৮২
১১. তদেব, পৃ ১৮৩
১২. তদেব, পৃ ১৮৪
১৩. তদেব, পৃ ১৮৭
১৪. তদেব, পৃ ১৯০
১৫. তদেব, পৃ ১৯১
১৬. তদেব, পৃ ১৯১
১৭. জীবন মিত্র, 'ঈশ্বর ধান', দেবেশ রায় (সম্পাদিত), আজহার ইসলাম (সম্পাদিত), 'প্রতিবেশী গল্প সংকলন (১৯৮৩-১৯৯৬)', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, পৃ ২৬১
১৮. তদেব, পৃ ২৬৪
১৯. তদেব, পৃ ২৬২
২০. তদেব, পৃ ২৬৫
২১. তদেব, পৃ ২৬৫
২২. তদেব, পৃ ২৬৫
২৩. তদেব, পৃ ২৬৬
২৪. তদেব, পৃ ২৬৬
২৫. তদেব, পৃ ২৬৬
২৬. তদেব, পৃ ২৬৭
২৭. তদেব, পৃ ২৬৮
২৮. তদেব, পৃ ২৬৮
২৯. তদেব, পৃ ২৬৮
৩০. তদেব, পৃ ২৬৮-২৬৯
৩১. তদেব, পৃ ২৬৯
৩২. তদেব, পৃ ২৬৯
৩৩. তদেব, পৃ ২৬৯
৩৪. তদেব, পৃ ২৬৯
৩৫. তদেব, পৃ ২৬৯

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

অ

অঙ্কিতা মুখার্জী : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তুফানগঞ্জ কলেজ

অনির্বাণ সাহু : বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

অনিন্দ্য পোদ্দার : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম

অনুপম মল্লিক : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

অনুপকুমার দাঁ : বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

অভিষেক ঘোষাল : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কৃষ্ণনাথ কলেজ

অর্কপ্রভ বাগচী : গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্পিতা দাস : সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া

অদিতি দে : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অরিজিৎ চক্রবর্তী : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

অশোক কুমার বিশ্বাস: সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম

অমেয় দাস : স্নাতকোত্তর ছাত্র, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আ

আনন্দময় ভট্টাচার্য : সহকারী অধ্যাপক, বাঁকুড়া রাইপুর মহাবিদ্যালয়

ই

ইন্দ্রাণী মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

উ

উত্তম কুমার মণ্ডল : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

উৎপল রায় : গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ক

কাকলি কুণ্ডু : বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বি.বি. কলেজ, আসানসোল

কঙ্কন রক্ষিত : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজল দাস : অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, হুগলি মহিলা মহাবিদ্যালয়, হুগলি

কুশল ভট্টাচার্য : স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি

কৌশিক অধিকারী : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

গ

গোপীনাথ দাস : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

গৌতম দাস : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ

চ

চন্দ্রানী দাস : সহকারী অধ্যাপক, কণ্ঠসংগীত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

47

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

Volume 27, Issue 4

Number 47

Published : January 2022

First Edition : July 2022

ISSN : 0976-9463

ISBN : 978-93-92110-02-3

TABU EKALAVYA

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
Ashis Chattopadhyay

President : Biplab Majee

Vice-President : Tapan Mondal

Executive Editor : Sushil Saha

Editor : Debarati Mallik

Working Editor : Tapas Pal

Editor-in-Chief : Dipankar Mallik

e-mail : tabuekalavya@gmail.com

Website : www.tabuekalavya.in

facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ১০০ টাকা

THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES

Chief Editor

Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick

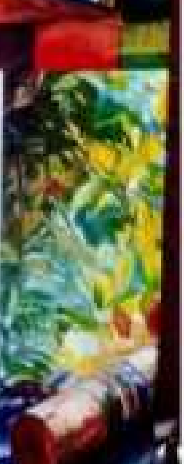

Managing Editor

Dr. Laksman Sarkar

Thoughts : Academic Writings in Languages

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick, Principal
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar, Librarian

Editorial Board
Dr. Rabindranath Ghosh, Deptt of Bengali (convener)
Dr. A.T.M. Sahadatulla Head, Deptt of Bengali
Mr. Avijit Mandal Head, Deptt of Sanskrit
Prof. Chandranath Adhikari, Head, Deptt of English
Dr. Kalavati Kumari, Head, Deptt of Hindi
Mr. Anindya Chakraborty, SACT, Deptt. of English
Dr. Kushal Chatterjee, SACT, Deptt. of Bengali
for
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Distributor
PROVA PRAKASHANI
Publisher & Book Seller
1K, Radhananth Mullick Lane
Kolkata 700 012

"THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES"
By RBC Evening College
Published by Sudarshan Prakashan, Kolkata. Rs. 400/-

ISBN : 978-93-83659-82-1

Published by
Arpita Mandal
Sudarshan Prakashan
7/1C, Radhananth Mallick Lane
Kolkata 700 012
Mobile : 9433194218

Copyright
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati
North 24 Parganas, West Bengal

First Published : February, 2023

All rights reseved. No part of this book may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the copyright holder.

Distributor:
New Pragati Prakashani
68/69 and 1039 Bakshah Bazar
Nilkhetra, Dhaka-1205, Bangladesh
and
Jnan Bichitra
11, Jaganath Bari Raod
Agartala-799001, Tripura, India

Cover: Shekhar Mondal

Printers:
Laksminarayan Press
T/31/K, Biplabi Barin Ghosh Sarani
Kolkata-700 067

Price : Four Hundred Only.

ঈশ্বরকথা

ড. কুশল চ্যাটার্জী

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা

কথামুখ

কোন ব্যক্তি যে-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পান বা বিখ্যাত হন, সাধারণ আলোচনায় উঠে আসে তাঁর সেই দিকগুলি। কিন্তু সেই ব্যক্তি'র পরিবার, ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা ইত্যাদি রয়ে যায় লোকচক্ষু'র আড়ালে; অথচ সেই দিকগুলি ছাড়া তো ব্যক্তিটি অর্ধেক। ব্যক্তিজীবনের সেই সব অজানা ঘটনা পাঠক-শ্রোতা'র কাছে তাঁকে আরও বেশী পরিচিত ক'রে তোলে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও বিষয়টি আলাদা নয়।

ঈশ্বরচন্দ্রকে 'দয়ার সাগর', 'শিক্ষাবিদ্', 'সমাজ-সংস্কারক', 'বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি নানা ভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝেই মনে প্রশ্ন জাগে, কেমন ছিলেন 'ব্যক্তিগত ঈশ্বর'? কেমন ছিলেন 'একান্ত পারিবারিক ঈশ্বর'? কেমন ছিলো তাঁর প্রক্ষোভের প্রকৃতি? কেমন ছিলো নিজের পরিজনদের সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি? এই লেখার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে সে-সবই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আয়তন যাতে না বাড়ে তাই অনেক ঘটনাই এখানে বাদ দিতে হয়েছে যদিও; আর বাদ দিয়েছি তাঁর ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি ঘটনা যা সাধারণত অনেকেই জানেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পারিবারিক ও শেষজীবন নিয়ে জানার ও জানানোর ইচ্ছা যখন মনে প্রবল ভাবে উদিত হ'ল তখন হাতে এলো একটি গ্রন্থের pdf. আবরণপত্র (Cover Page), নামপত্র (Name Page/Title Page), তথ্যপত্র (Information Page)- ইত্যাদি কিছুই সেই pdf-এ পাইনি। কয়েকটি সাদা পাতার পর হঠাৎ একটি চলমান লেখা'র শেষাংশ দিয়ে বইটি শুরু। তার পরের অংশ শুরু হয়েছে 'দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।'—এই শিরোনাম দিয়ে। হয়তো অংশটির সূচনা হয়েছিলো 'প্রথমবারের ভূমিকা।' দিয়ে এবং একেবারে শেষাংশে পাই 'ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'-এই নামটি। এরপর গ্রন্থটি'র পাতায়-পাতায় একপাতায়

'বিদ্যাসাগর।' আর অপর পাতায় আমাদের নাম লেখা। যার থেকে অনুমেয় যে, গ্রন্থটি'র নাম *বিদ্যাসাগর* ও লেখকের নাম **শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।** গ্রন্থটি'র, বিশেষত এর দশম অধ্যায় ('পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে') ও চতুর্দ্দশ অধ্যায় ('স্বর্গারোহণ')—অবলম্বনে এই লেখাটি লিখেছি। তবে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু'র কারণ জানতে **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর— উইকিপেডিয়ার** দ্বারস্থ হয়েছি। পাশাপাশি বিদ্যাসাগর ও তাঁর পুত্রের মানসিক দূরত্বের কারণ জানতে ও জানাতে সাহায্য নিয়েছি **বিদ্যাসাগর ও তাঁর বখে যাওয়া ছেলে নারায়ণচন্দ্র** লেখাটি'র online/soft copy- সংস্করণের ওপর। কোন্ কোন্ গ্রন্থ বা লেখার সাহায্যে আমার নিম্নোক্ত লেখাটি লিখেছি তা এই অংশে উল্লেখ করলাম। এই অনুচ্ছেদটিকে তাই **তথ্যসূত্র বা উল্লেখপঞ্জী** হিসেবে বিবেচনা করতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করবো।

পরিশেষে একটি কথা ব'লে এই অংশের ইতি টানবো। আমি আমার লেখায় 'দয়ার সাগর', 'শিক্ষাবিদ্', 'সমাজ-সংস্কারক', 'বিদ্যাসাগর'-এর কথা তুলে ধরতে চাই নি। তুলে ধরতে চেয়েছি, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র 'পারিবারিক' ঈশ্বরের কথা। তাই লেখাটি'র মূল অংশে তাঁকে 'ঈশ্বর' বা 'ঈশ্বরচন্দ্র' বলেই উল্লেখ করেছি।

---

(১)

ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ৫ পুত্র (নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ)-এর মধ্যে তৃতীয় পুত্র রামজয়ের দুইপুত্র ঠাকুরদাস ও কালিদাস। জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের আবার ৭ পুত্র (ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র এবং ভূতনাথ ওরফে শিবচন্দ্র)-এর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

১৭৪২ শকাব্দ, ১২ই আশ্বিন, ১২২৭ সন, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সাল, মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতীদেবী'র ঘরে। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মসংক্রান্ত একটি কাহিনী শোনা যায়। শোনা যায় তাঁর জন্মের কিছু আগে না কী তাঁর মাতৃদেবী হঠাৎ উম্মাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তখন জনৈক ভাগানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য নামক কোন-এক জ্যোতিষী গণনা ক'রে জানান যে, ভগবতীদেবী'র গর্ভে কোন-এক ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ জন্মাবেন। তাঁর তেজ সহ্য করতে না পেরেই ভগবতী'র এই চিত্তবৈকল্য। সন্তান

জন্মানোর পর তিনি সুস্থ হবেন ও নিজের পূর্বমতি ফিরে পাবেন। আশ্চর্যজনক ভাবে সন্তান, অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মানোর পর সত্য সত্যই ভগবতীদেবী সুস্থ হন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মসংক্রান্ত অপর একটি কাহিনী হ'ল—ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী ও তীর্থপর্যটনকারী। একদা তিনি স্বপ্ন-জ্ঞাত হন যে, তাঁর বংশে এক অদ্ভুত বালকের জন্ম হবে, সেই বালক নিজের শৌর্য-বীর্য-জ্ঞান-কর্ম-মহত্ত্ব ও ঔদার্য দ্বারা বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এরপর তিনি স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হলে না কী তিনি পৌত্রের জিহ্বার নীচে আলতায় কিছু-একটা লিখে শিশু'র ভবিষ্যৎ-জীবনের আগাম জয়বার্তা ঘোষণা ক'রে বলেন যে, তিনি হলেন এর দীক্ষাগুরু, শিশু ভবিষ্যতে আর অন্য গুরু গ্রহণ করবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মানোর সময় পিতা ঠাকুরদাস বাড়িতে ছিলেন না, নিকটস্থ কোমরগঞ্জেরহাটে গিয়েছিলেন। পিতা রামজয় পুত্রকে শুভ-সংবাদ দেওয়ার জন্যে সেই পথে গমন করেন। পথে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হলে পিতা পুত্রকে রহস্য ক'রে জানান যে, এক 'এঁড়ে বাছুর' জন্মেছে। বাড়িতে তখন সত্যই এক গর্ভবতী গাভী ছিলো। ঠাকুরদাস বাড়ি এসে তাই গোয়ালের দিকে যেতে গেলে রামজয় পুত্রকে সূতিকাগৃহের কাছে এনে তাঁর 'এঁড়ে বাছুর'কে দেখান ও ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে এই শিশু ভয়ঙ্কর জেদী ও একগুঁয়ে হবে। শেষে তিনি পৌত্রের নামকরণ করেন—ঈশ্বরচন্দ্র। পিতা ঠাকুরদাসের অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণুতা, লেখাপড়ার প্রতি প্রীতি, জীবিকার্জনের ও রক্ষার প্রতি অদম্য জেদ এবং জীবন-সংগ্রামে হার না মানার মানসিকতা এবং মাতা ভগবতীদেবীর দয়াপরবশতা আর অনুকম্পা—এ সবই ঈশ্বর পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার-সূত্রে।

(২)

শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র চঞ্চল ও দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রাস্তার পাশের ধানের ক্ষেত থেকে কচি ধান তুলে নিয়ে যেতেন, ফসল নষ্ট করতেন। শোনা যায়, একবার না কী যবের শীষ খেতে গিয়ে গলায় বিঁধে তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিলো। ছাত্রদের প্রতি স্নেহপ্রবণ গুরুমশায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালাতেই ঈশ্বরচন্দ্র'র বিদ্যাশিক্ষার শুভ সূচনা হয়। এই স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় এক বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র জ্বর, উদরাময়, প্লীহাজ্বরে একটানা

কাবু হয়ে পড়েন, যে এক-প্রকার তাঁর বাঁচার আশাই সকলে ত্যাগ করেছিলেন। তবে দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর তিনি রোগমুক্ত হন।

গ্রামের পাঠশালা'র পাঠ সমাপনান্তে ঈশ্বর পিতা'র সাথে কলকাতায় গমন করেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে। পথে মাইল-ফলক দেখে ইংরেজী অঙ্ক-শিক্ষা ক'রে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ১২৩৫ সনের কার্তিক মাসে ঈশ্বরের কলকাতা-বাস শুরু হয় জগদ্দুর্লভ সিংহ মহাশয়ের বাড়িতে।

কলকাতা'র প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরের পড়াশোনা শুরু হ'ল গুরুমশায় স্বরূপচন্দ্র দাস মহাশয়ের পাঠশালায়। এবার স্বগ্রামে ফিরতে হ'ল ঈশ্বরকে। উপলক্ষ তাঁর রক্ত-অতিসার রোগ। এরপর সুস্থ হয়ে তিনি আবার কলকাতায় ফেরেন। এই সময় কেউ কেউ ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন পুত্রকে ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের ইচ্ছে ছিলো যে, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত-শিক্ষায় শিক্ষিত হোক (ন)। তাই শেষে তিনি পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি ক'রে দেন।

মেধার পরিচয় ঈশ্বর সর্বদা দিয়েছেন। ১৮২৯ সালের ১লা জুন, ৯ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং এর ৬ মাস পরের পরীক্ষাতেই তিনি ৫ টাকা বৃত্তি পান। পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা চলতে থাকে। প্রতিদিন ঈশ্বর কলেজ থেকে যা শিখতেন, পিতাকে তা শোনাতে হতো। সারাদিনের পরিশ্রমে বাড়িতে ফিরে ঈশ্বর প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। ঠাকুরদাস কর্মস্থল থেকে ফিরে এর জন্যে প্রচণ্ড প্রহার করতেন পুত্রকে। আবার ভোররাতে পুত্রকে ঘুম থেকে তুলে মুখে মুখে বহু কবিতা শেখাতেন। এইভাবে ঠাকুরদাসের তত্ত্বাবধানে ঈশ্বরের জ্ঞানের ভিত মজবুত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন তাঁর ক্ষুদ্র শরীর ও বৃহৎ ছাতা মাথায় নিয়ে পথ চলতেন, তখন দূর থেকে মনে হ'ত বুঝি কোন ছাতা একা একা পথের ওপর দিয়ে চলেছে। তাঁর মথার বৃহৎ আকৃতি'র জন্যে তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে 'যশুরে কৈ-কশুরে যৈ' ব'লে মস্করা করতেন।

ঈশ্বরের জেদ ছিলো মারাত্মক। শোনা যায়, যেদিন ঠাকুরদাস চাইতেন যে পুত্র আজ স্নান করুক, সেদিন তিনি তা উল্টো ক'রে পুত্রকে আদেশ দিতেন : অর্থাৎ, 'আজ স্নান ক'রো না'-বিষয়টি এমন। কারণ, তিনি জানতেন যে, তিনি যা আদেশ দেবেন, পুত্র এক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই করবে। ঈশ্বর এ

জেদের বশেই তাঁর শিক্ষকদের মন জয় করেছিলেন। একাদশ বছরে উপনয়ন হয় তাঁর। এই অল্প-বয়সে তিনি সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়াশোনা করতে মনস্থির করেন। বয়সের স্বল্পতা হেতু এই শ্রেণী'র শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার আপত্তি করলে ঈশ্বর সেই জেদ ধরেন। শেষে জয়গোপাল তাঁকে তাঁ'র কবিতার অর্থ জানতে চাইলে ঈশ্বর এর ব্যাখ্যা দিয়ে সকলকে চমৎকৃত ক'রে দেন ও সাহিত্য-শ্রেণীতেই যোগ্যতার সাথে নিজের জায়গা ক'রে নেন। এরপর সংস্কৃত-শিক্ষার জন্যে ঠাকুরদাস তাঁর অপর পুত্র দীনবন্ধুকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। সংসারের দায়িত্ব-কর্ম বেড়ে গেলো। ঈশ্বর সব নিজে হাতে করতেন। সেই সাথে চলতো পড়াশোনা। এইভাবে ধীরে ধীরে ছোট্ট ঈশ্বর হয়ে উঠলেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৩)

১৮৩৫ সালের সূচনা-লগ্নে মোটামোটি ১৫ বছর বয়সে ঈশ্বরের বিবাহ হয় দীনময়ীদেবী'র সাথে। সে সময়ে বাসরঘরে তিনি বেশ বুদ্ধিমত্তা ও রসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেকালে বিবাহ-পূর্বে পাত্র-পাত্রী নিজেদের মধ্যে তেমন পরিচিত হওয়ার সুযোগ তেমন পেতেন না। শুভদৃষ্টির সময়ে লোকসমাগমে ও ব্যস্ততার প্রেক্ষাপটে লজ্জার আভরণ পরে পাত্রী ঠিকঠাক দৃষ্টি-বিনিময় করতে পারতেন না। বাসরে এরই সুযোগ নিতেন পাত্রপাত্রী'র রসনাস্থানীয়েরা। ঈশ্বরচন্দ্রও এর ফাঁদে পড়েন। তাঁকে বাসরঘরস্থিত অবগুণ্ঠিত কন্যাদের মধ্যে নববধূকে খুঁজে বার করতে বলা হয়। রসিক ও চতুর ঈশ্বর এক কন্যার হস্তধারণ ক'রে তাঁকেই নিজের স্ত্রী ব'লে দাবী করেন। বাসরঘরে হুলুস্থুল প'ড়ে যায়। নির্বিকার ঈশ্বর জানান যে, এতে তো তাঁর কোন দোষ নেই, তাঁকেই তো বলা হয়েছিলো নিজের স্ত্রীকে খুঁজে নিতে। শেষে উক্ত রমণী কাঁদো কাঁদো হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুঁজে দেবেন। তারপর তিনি মুক্তি পান।

বিবাহের পর বহু বছর সন্তানাদি না হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর সমগ্র পরিবার নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে কাটান। শেষে ১৮৪৯ সালে (কার্তিক মাসের শেষে) তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মান—নারায়ণচন্দ্র, ইনি ছিলেন ঈশ্বর ও দীনময়ীদেবী'র একমাত্র পুত্রসন্তান। এরপর অবশ্য ৪ কন্যার পিতা হন ঈশ্বর—হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী—

ঈশ্বরচন্দ্র + দীনময়ী

নারায়ণচন্দ্র	হেমলতাদেবী	কুমুদিনীদেবী	বিনোদিনীদেবী	শরৎকুমারীদেবী
+	+	+	+	+
ভবসুন্দরীদেবী	গোপালচন্দ্র সমাজপতি	অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	সূর্যকুমার অধিকারী	কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১পুত্র, ৩ কন্যা	২ পুত্র	৩ পুত্র, ৪ কন্যা	৩ পুত্র, ৪ কন্যা	২ পুত্র, ১ কন্যা

ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ঠাকুরদাস তাঁর জীবিকা ত্যাগ ক'রে বীরসিংহেই অবস্থান করেন বাড়ি'র অভিভাবক হয়ে। ঈশ্বর থাকতেন কলকাতায়। কখনও কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কালে-ভদ্রে বাড়ি যেতেন। গ্রামে গেলে ঈশ্বরের সময় কাটতো গ্রামের সাধারণ মানুষজনদের সাথেই। শুধু নিজের পরিবারেরই নয়, গ্রামের বহু লোকেরও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ঈশ্বর নিজে পালন করতেন। তাঁর এই দানশীলতায় একবার তাঁর পরিবারের ওপর বিপর্যয় নেমে আসে। প্রভূত লোককে সাহায্য করেন, সুতরাং তাঁর বাড়িতে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত আছে, এই অনুমানে তাঁর বাড়িতে একবার ডাকাত পড়ে। ডাকাত-দল সর্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে চলে যায়। ঠাকুরদাস হাটের পথে চলেন গৃহের জিনিসপত্র পুনর্বার ক্রয় করার জন্য। এই সময় ঈশ্বর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটান। সহোদর ভাইদের ও সমবয়সীদের নিয়ে বাড়ি'র সামনের মাঠে তিনি কবাডি খেলতে লেগে যান। এতটাই ছিলো তাঁর শিশু-সারল্য।

নিজের জীবনে প্রচণ্ড কষ্ট ক'রে একলা ঠাকুরদাস সংসার প্রতিপালন করতেন। নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রের শিক্ষার, উচ্চশিক্ষার ভিত নিজের হাতে তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। আবার প্রচণ্ড প্রহার, শাসন, তত্ত্বাবধান ও ঐকান্তিক স্নেহ-ভালোবাসায় পুত্রের জীবন গড়ে দিয়েছিলেন সেই তিনিই। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পিতাকে জীবিকা-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পরম নির্ভাবনা, নিশ্চিন্তের জীবন-দান ক'রে গৃহস্বামী'র তত্ত্বাবধানের কর্মটিতে আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁকে বীরসিংহে নিজের বাড়িতে প্রেরণ করেন। নিজের জীবনের শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও শাসনপ্রিয় স্বভাবের বশবর্তী হয়ে এই ঈশ্বরই একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ও নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের প্রতি পিতা'র অত্যধিক প্রশ্রয়ে বিরক্ত হয়ে পিতাকে তিরস্কারও করেছিলেন। আবার এই পুত্রই আবার পিতা'র কাশীবাসের সিদ্ধান্তে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে এর প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন।

একপ্রকার কান্নাকাটি করেই পিতাকে সেই যাত্রায় নিরস্ত করতে না পেরে শেষে ঠাকুরদাসের পরমপ্রিয় নিজপুত্র নারায়ণকে দিয়ে তাঁর পিতাকে নিজগৃহে আনয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাস তবু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। অবশেষে কাশীতে তাঁর সমস্ত রকম সুখ-শান্তির ব্যবস্থা ক'রে তবেই ঈশ্বর ঠাকুরদাসকে সেখানে প্রেরণ করেন। নিজে বারবার সশরীরে কখনও লোক পাঠিয়ে ঈশ্বর পিতার সংবাদ ও সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন। ঠাকুরদাস শেষে সেই কাশীতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঠাকুরদাসের কাশীবাসের দৃঢ় সংকল্পের নেপথ্যে ছিলো একটি কাহিনী—একদা রাতে তিনি না কী স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে চলেছে। পাশাপাশি তাঁদের ভাই-এ-ভাই-এ হবে মনোমালিন্য এবং বীরসিংহে তাঁদের বাড়িটির প্রভূত ক্ষতি হবে। হ'লও তাই। ঈশ্বর সবসময় চাইতেন গৃহে সর্বদা শান্তি বিরাজ করুক। তিনি নিজে তাঁর ভ্রাতাদের জন্যে আলাদা আলাদা ক'রে গৃহ-নির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন, যাতে একত্রে থাকলে যেন বৃহৎপরিবার-হেতু নিজেদের মধ্যে কখনও মনোমালিন্য না হয়। ১২৭৫ সন (১৮৬৯ সাল)-এর চৈত্র মাসের কোন-এক রাত্রির দ্বিপ্রহরে বীরসিংহের বাড়িতে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র ২০০ টাকা ধার ক'রে একটি ছাপাখানা ক্রয় করেছিলেন। সেইটির সত্ত্বাধিকার দাবী ক'রে ভ্রাতা দীনবন্ধু মামলা ক'রে বসেন। পরে অবশ্য তিনি নিজের দাবী প্রত্যাহার করেন, তবে ততদিনে ভাই-ভাই-এ যথেষ্ট মনোমালিন্য ঘটে গেছে। তবু কিন্তু ভাই-এর সাংসারিক অনটনে ঈশ্বর দীনবন্ধু'র স্ত্রী'র আঁচলে সংসারখরচের টাকা অত্যন্ত স্নেহাদরে বেঁধে দিয়েছিলেন। যদিও পরে দীনবন্ধু বিষয়টি জানতে পেরে দাদা'র প্রদেয় টাকা ফেরৎ পাঠান। এই দীনবন্ধু'র ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের চাকরি কিন্তু ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানেই ঘটেছিলো।

ঈশ্বরের সাথে বীরসিংহের সংযোগ কেন ছিন্ন হয়েছিলো? এই বিষয়ে জানা যায়—ক্ষীরপাই-নিবাসী কোন-এক মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহিনী নাম্নী এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ঈশ্বরের নিকট যোগাযোগ করেন। ঈশ্বর সাহায্যে সম্মত হয়ে বীরসিংহে গমন করেন। কিন্তু বীরসিংহে এসে ঈশ্বর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। যাঁরা ইতিপূর্বে তাঁকে বহুবার বিভিন্ন বিধবাবিবাহ সংঘটনে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাই যে-কোন কারণেই হোক ঈশ্বরকে এই বিবাহ থেকে দূরে থাকতে বলেন।

প্রাথমিকভাবে ঈশ্বর এই পরামর্শে অসম্মত হন, কারণ যেহেতু তিনি পূর্বেই এই বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। তবু বহুলোকের অনুরোধ-উপরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি এই বিবাহ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ঐ বিবাহ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিলোও, আর তা সংঘটিত হয়েছিলো তাঁরই বাড়ি'র খুব কাছে। শুধু তা-ই নয়, শোনা যায় এই বিবাহের অন্যতম হোতা ছিলেন তাঁর ভ্রাতা দীনবন্ধু। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বীরসিংহ ত্যাগ করেন।

ধীরে ধীরে ঈশ্বর সংসার-পরিবার সকল বিষয়ে ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েন। ১২৭৬ সনের ১২ থেকে ২৫ শে অগ্রহায়ণের মধ্যে মাতা, স্ত্রী, জনৈক কোন এক শুভাকাঙ্ক্ষী গদাধর পাল এবং পিতাকে লিখিত ১টি ক'রে পত্রে আর তিন সহোদর—দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের লিখিত ১টি ক'রে পত্রে সংসারের প্রতি তাঁর অভিমান ও খেদই প্রকাশিত হয়েছে। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬-এ মাতা ভগবতীদেবীকে ঈশ্বর যে পত্র লেখেন তাতে সংসারের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহা, বিনয়পূর্বক মাতা'র চরণে ক্ষমাপ্রার্থনা, নিত্যব্যয়নির্বাহের জন্যে আমৃত্যু মাসিক ৩০ টাকা ক'রে প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬-এ স্ত্রী দীনময়ীদেবীকে লিখিত পত্রেও তাঁর সংসারের প্রতি বীতস্পৃহতা আর কিছু উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত পত্রে সবথেকে লক্ষনীয় পুত্রকে 'আপনি'-সূচক উল্লেখ। নিজ-পত্নী'র কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা ও পুত্রকেন্দ্রিক 'আপনি'-সূচক শব্দ-প্রয়োগের নেপথ্যে কী কোন অভিমান লুকায়িত ছিলো? তবে এখানেও 'উপযুক্ত পুত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যয়নির্বাহের জন্যে ঈশ্বরের 'ব্যবস্থা' ক'রে দেওয়ার কথা জানা যায়। বীরসিংহনিবাসী জনৈক শুভানুধ্যায়ী গদাধর পালকে তিনি যে পত্রটি লেখেন সেটির থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর মনোস্থির করেছেন আর তিনি বীরসিংহে যাবেন না। তবে তিনি এও অঙ্গীকার করেছেন যে, গ্রামের বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ে তিনি যেরূপ মাসিক সাহায্য করতেন সেই সাহায্যগুলি তিনি বন্ধ করবেন না। এক্ষেত্রেও ক্ষমা-প্রার্থনা লক্ষনীয়। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সনে তিনি যে পত্র পিতৃদেবকে লেখেন তাতেও তিনি অপরাধ মার্জনার প্রসঙ্গ এনেছেন। তবে এই পত্রের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমত—পিতার ভরণপোষণের অঙ্গীকার ব্যক্ত হলেও এই পত্র থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর সকলকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ দিকে তিনি ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়ত—এর থেকে

এও জানা যায় যে, ঋণমুক্ত হলেই তিনি কোন নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাস করতে চাইছেন। তৃতীয়ত—এই পত্রেই তাঁর অবরুদ্ধ অভিমানের উৎসমুখ খুলে গেছে। তিনি পিতার নিকট ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি তাঁদের কাছ থেকে নিজের জন্যে দয়া আর স্নেহ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি তা পান নি। পিতার কাছে নিজেকে সংসারের 'হতভাগ্য' ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মধ্যম-ভ্রাতা দীনবন্ধুকে তিনি লেখেন যে, যদি মনে হয় কোন বিষয় তাঁকে জানানোর প্রয়োজন তবে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠকে জানাতেই পারেন এবং সংসার-নির্বাহের জন্যে তিনি যদি অর্থগ্রহণে সম্মত হন, তো ঈশ্বর তাঁকে মাসিক ৭০ টাকা ক'রে প্রেরণ করতে পারেন। তবে এখানেও ক্ষমা-প্রার্থনা অব্যাহত। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে যে পত্র ঈশ্বর লিখেছিলেন তার থেকেই জানা যায় যে, এযাবৎ তিনি তাঁর সংসারের জন্যে যে অর্থ-সাহায্য করেছেন, সেটা তিনি বজায় রাখবেন। জ্যেষ্ঠ এখানে অনুজকে প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পরামর্শ দিয়েছেন। ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রকে লিখিত পত্রের থেকে জানা যায় যে, জ্যেষ্ঠ তাঁর ব্যবসায় সাহায্য করেছিলেন এবং ঈশান যদি চান তো তাঁর সংসার-নির্বাহের জন্যে তিনি মাসে মাসে ৩০ টাকা ক'রে পাঠাতে পারেন।

পরিজন-পরিচিতজনদের উদ্দেশ্যে লিখিত ঈশ্বরের এই পত্রগুলিতে তাঁর যে রূপটি ধরা পড়ে তাতে তাঁর দায়িত্ববোধ, বিনয় ও অপারগ হয়েও সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সমাজ ও জনকল্যাণের দিকটিও। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধের পুনঃ পুনঃ প্রকাশ এক মার্জিত ও প্রকৃত সুশিক্ষিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তুলে ধরেছে। পত্রগুলিতে উপযুক্ত স্থানে প্রকাশিত হয়েছে উপদেশও; আর পত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরের মনের নিভৃতে লুক্কায়িত অভিমান কখনও এগুলি থেকে উৎসারিত হয়েছে আবেগের প্রবাহ।

কেমন ছিলো ঈশ্বর ও তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণের মধ্যেকার সম্পর্ক? ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫-তে নারায়ণ বৃদ্ধ পিতাকে যে পত্র লিখেছিলেন সেখানে তিনি তাঁর পূর্বকৃত পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। নিজেকে কুকুর ও পিতাকে তার প্রভু'র সাথে তুলনা ক'রে পিতার সান্নিধ্য কামনা করেছেন নারায়ণ। হয়েছেন তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ। তবে পুত্রবধূ'র সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগ ছিলো এবং পুত্র-পুত্রবধূ'র পরিবারকে তিনি প্রভূত অর্থসাহায্য করতেন।

কিন্তু কী কারণে পিতা-পুত্রের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিলো? নারায়ণ

বিধবাবিবাহ (হুগলী'র খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়সী বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী) করলে যে ঈশ্বর পুত্রের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেই তিনিই কেন পরে উইলে জানান যে, তিনি পুত্রের 'সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন'? আসলে শোনা যায় যে, জনৈক মধুসূদন ভট্টাচার্যের সন্তানসন্ততিহীন স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে তাঁর স্বামী'র সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সমাজের মাতব্বরেরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। ঈশ্বরপুত্র নারায়ণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বর স্বয়ং এই বিন্ধ্যবাসিনীকে মাসোহারা দিতেন। এই ঘটনায় ঈশ্বর যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন পুত্রের প্রতি। এর ফলেই পিতা-পুত্রের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পুত্রের অনুশোচনা ও মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রী দীনময়ী'র প্রার্থনায় ঈশ্বর আবার তাঁর পুত্রকে কাছে টেনে নেন।

একবার ঠাকুরদাস পীড়িত হয়ে পড়েন। কাশী থেকে ৮৩ বছরের ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঈশ্বর কাশীতে পিতৃদর্শনের জন্যে গমন করেন। ১২৭৭ সনের ২রা ফাল্গুন দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র ভগবতীকে নিয়ে কাশীতে গমন করেন। ঈশ্বরও সেখানে পৌঁছান। সকল সুবন্দোবস্ত ক'রে ঈশ্বর ১২ই ফাল্গুন কলকাতায় ফিরে আসেন। ঠাকুরদাস ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ১২৮৩ সনের ১লা বৈশাখ সন্ধ্যার ঠিক আগে ঠাকুরদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি প্রবল বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন।১২৭৯ সনের ২৩শে মাঘ লোকান্তরিত হন ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি। জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতাদেবী'র কঠোর বৈধব্যজীবনে পীড়িত হয়ে ঈশ্বর নিজে মৎস্যভক্ষণ ও নৈশ আহার ত্যাগ করেন। শোনা যায় ঈশ্বর জীবনের শেষদিকে হোমিওপ্যাথী চর্চা করতেন।

১২৯৫ সনের ১লা ভাদ্র সন্ধ্যার পর রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেন দীনময়ীদেবী। পত্নীবিয়োগে পুরোপুরি ভেঙে পড়েন ঈশ্বর। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগ গ্রাস করতে থাকে তাঁকে। তবু এর মধ্যে-মধ্যেই যখন একটু তুলনামূলক সুস্থ বোধ করতেন, তখনই নিজের কাজে মনোনিবেশ করতেন। ১২৭৯ সনের শেষভাগ থেকে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্বর ও যন্ত্রণায় কাবু হয়ে পড়েন তিনি। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই, ১২৯৮ সনের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি। ২টো ১৮ মিনিটে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

।। শ্রীমতী হে ।।

ড. কুশল চ্যাটার্জী

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি উত্তর ২৪ পরগণা

কথামুখ : রবীন্দ্রচর্চার অতল অম্বুধিতে আমি এক ভাসমান ছিন্নপত্রমাত্র। ভগ্নাংশের জ্ঞান নিয়ে শ্রীমতী কাদম্বরীদেবী ও তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের স্বরূপ-পরিচয় নিয়ে কিছু বলা, আমার মতো অজ্ঞের ক্ষেত্রে বাতুলতা। তবু 'বহমান গঙ্গায় কে না হাত ধুতে চায়!' তাই কাদম্বরীদেবী ও রবীন্দ্র-কাদম্বরীচর্চার বহমান আলোচনার তটিনীতে আমার এ এক সাহসী অবগাহন। প্রাবন্ধিক নিজের মত ও পথ অনুসারে প্রবন্ধ লেখেন। পাঠক তাঁর মতের সাথে একমত না-ও হতে পারেন, আবার হতেও পারেন। তাই এই প্রবন্ধে আমি এখনও পর্যন্ত কাদম্বরীদেবী ও রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্বন্ধে যা, যা জেনেছি, ঝাড়াই-বাছাই ক'রে সেগুলি থেকে সপ্রমাণে যেগুলি নিজে বিশ্বাস করি, সেগুলিই এখানে তুলে ধরলাম। পাঠকের কোন দায় নেই আমার মতের সাথে একমত হওয়ার। রবীন্দ্র-কাদম্বরীচর্চার কোন কদর্য—শেলে যদি কোন রুচিশীল রবীন্দ্রপ্রেমী আঘাতপ্রাপ্ত হন, তবে আশাকরি আমার এই লেখা তাঁকে 'প্রাণের আরাম দেবে', দেবে শান্তি। পাশাপাশি কাদম্বরীকেন্দ্রিক বহুল প্রচলিত কোন গালগল্প যদি কোন সুধী'র কখনও অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়, তবে বিশ্বাস্য-বিষয়টির সাথে পরিচিত হতে তাঁরা এই লেখাটি পড়তে পারেন। আসলে মিথ্যার এমনই গুণ, 'বারবার প্রচলিত হতে হতে জনমানসে তা সত্যে পরিণত হয়।' কাদম্বরীদেবী ও তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে 'অনেক পড়াশোনা' আমার নেই। তাই মূলত মাত্র ৪খানি গ্রন্থের যুক্তির সাহায্যে আমি আমার এই প্রবন্ধের কায়া-গঠন করেছি। কারণ, এই ৪খানি গ্রন্থের যুক্তি আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। তাঁর মধ্যে ২খানি তো স্বয়ং গুরুদেবেরই লেখা। সেগুলি হ'ল—জীবনস্মৃতি (১৯১২) ও ছেলেবেলা (১৯৪০)। রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কের স্বরূপ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যা উল্লেখ করেছেন, তা তো বিশ্বাস করতেই হয়। তৃতীয়

গ্রন্থটি হ'ল জগদীশ ভট্টাচার্যের *কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য।* কেন এই গ্রন্থ নির্বাচন? "আসলে কবিমানসী লেখার সময়ে জগদীশ ভট্টাচার্যের নীতিই ছিল, প্রথমত, জনশ্রুতি নির্ভর কুত্র তথ্যকে কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না ; দ্বিতীয়ত, মুদ্রিত তথ্যও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হলে তবেই গৃহীত হবে ; তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথেরই বাণীপ্রকাশের মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে তাঁর কবিতা, গান ও মন্ময় গদ্যরচনাসমূহ।"[১] আর শেষ গ্রন্থটি হ'ল পণ্ডিতপ্রবর তপোব্রত ঘোষের *কবিমানসী ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা।* কেন এই গ্রন্থ? না, সেটা বলবো না। এর জন্যে উক্ত গ্রন্থটি পড়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল।

---

(১)

৫ জুলাই, ১৮৫৯। শ্যাম (শ্যামলাল) গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্যসুন্দরীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান, যিনি পরবর্তীতে পরিচিতা হন কাদম্বরী নামে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সুপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে তাঁর বিবাহ হয় ৫ জুলাই, ১৮৬৮ সালে। ঠাকুরবাড়িতে নববধূ হয়ে এই তাঁর পদার্পণ।

আদরের ভ্রাতা জ্যোতি'র সাথে শ্যাম গাঙ্গুলী'র মেয়ের বিয়েতে শোনা যায়, দাদা সত্যেন্দ্রনাথের না কি মত ছিলো না। পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে তিনি একটি পত্রে এই বিষয়ে লেখেন—

> "...তবে নতুনের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিবাহের আর বিলম্ব নাই—শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে—আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না।"[২]

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই আপত্তির কারণ? ভাই-এর বাল্য-বিবাহ? তা-ই কি মেনে নিতে পারেননি সংস্কারপন্থী সত্যেন্দ্রনাথ? যদি তাই হয়, তিনি নিজে যখন ১৭ বছর বয়সে বিবাহ করেন, তখন পাত্রী জ্ঞানদানন্দিনী'র ৭ (মতান্তরে ৯) বছর বয়সকে কীভাবে মেনে নিলেন? জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের সময়ও তো কাদম্বরী'র বয়স ছিলো ৯ বছরই। আর যদি 'শ্যামবাবু'র মেয়ে' ব'লে কাদম্বরী'র সাথে ভাই-এর বিবাহে তাঁর আপত্তি থাকে, তবে কেন কাদম্বরী'র 'ঠাকুরদা' জগমোহন সম্বন্ধে ঠাকুরবাড়ি'র সদস্যদের মন্তব্যে কোন অবজ্ঞা তো

দুর উল্টে সহজেই চোখে পড়ত ("জগমোহন গাঙ্গুলী মশায়ের ছিল রান্না আর খাবার শখ।..."[৩])? যে পরিবারে পিতা এত সম্মান পান, সেই পরিবারে সাধারণত পুত্রের সম্মানও তো অক্ষুণ্ণ থাকার কথা। তবে এই ক্ষেত্রে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাইবো। সত্যেন্দ্রনাথ একাধারে এই সময়ে চাইতেন ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করুন, অন্যদিকে প্রগতিশীল ও উচ্চশিক্ষিত স্বামী'র ছোঁয়াচ-লাগা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাত্রী হিসেবে মনোনীত ক'রে ফেলেছেন সূর্যকুমার (গুডিভ) চক্রবর্তী'র বিদুষী বড়মেয়েকে। যদিও সে বিবাহ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি, একথা বলাই বাহুল্য। সে যাই হোক, তবে বিস্মিত হ'তে হয় ঠাকুরবাড়ির সর্বময় কর্তা মৃদু ও স্বল্পভাষী দেবেন্দ্রনাথ, যাঁর প্রবল প্রতাপ বা রাজকীয় অবস্থানের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেন এইভাবে—

"বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প-কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোন ত্রুটি হয়, এই জন্যে মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্যে পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, উঁকি মারিতে আমার সাহস হয় না।"[৪]

—সেই তাঁকে যখন নিজের এক পুত্র (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)-এর বিবাহ স্থির হওয়ার পর তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় অপর পুত্র (সত্যেন্দ্রনাথ)-এর কাছে এইভাবে, তখন অবাক্ই হতে হয়—

"জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এই ভাগ্য। একে ত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমাদের ভয় করে। ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে- তোমাদের সময় এ সংকীর্ণতা থাকিবে না।"[৫]

হতে পারে এই শিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের প্রতি পিতার জবাবদিহি-পরিণতির দায়বদ্ধতা।

(২)

কাদম্বরীদেবী'র পিতৃবংশ সম্বন্ধে এবার একটু আলোচনা করা যাক। এর কারণ ত্রিবিধ—

ক. কাদম্বরীদেবী'র পিতা-পিতামহ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ভুল তথ্যের সত্যাসত্যের স্বরূপ উদঘাটন।

খ. কী, কী গুণাগুণ তিনি বংশপরম্পরায় অর্জন করেছেন—তা দেখানো।

গ. তাঁর পিতৃবংশের সংস্কৃতিবোধ, কলানৈপুণ্যের পরিচয়-দান।

কবিমানসী ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-কাদম্বরী *চর্চা* থেকে জানা যায় যে, কাদম্বরীদেবী'র ঠাকুরদা' জগমোহন গানে, রন্ধনে, কারুশিল্পে ছিলেন 'গুণী ও গুণগ্রাহী'। পাশাপাশি ছিলেন সঙ্গীতরসিক ও খাদ্যরসিকও। সত্যেন্দ্রনাথ একদা তাঁর আমার বাল্যকথা-য় জগমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "এমন সৌখিন অথচ কর্মিষ্ঠ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। খাওয়া, পরা, ওঠা বসা, প্রত্যেক কার্যে তাঁর কারিগরি প্রকাশ পেত। রান্নাবান্না ঘরকন্না-পোষাক সাজসজ্জা, কারুকার্যে, ছুতোরের, কামারের কাজ-সকল কর্মেই তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।"[৬]

এই জগমোহনের কাছেই সত্যেন্দ্রনাথ উর্দুর প্রথম কিতাব *চাহার দরবেশ* শিখেছিলেন।

'জন্মসূত্রে ও বিবাহসূত্রে ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতার গ্রন্থিতে বাঁধা' জগমোহন ছিলেন দক্ষিণডিহির নন্দরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্র। জগমোহনের ছিলো ৫ পুত্র-গোপাললাল, রসিকলাল, রামলাল, শ্যামলাল ও বিহারীলাল।। জগমোহনের দ্বিতীয়পুত্র রসিকলাল শিল্পকলায় ছিলেন নিপুণ। তৃতীয়পুত্র রামলাল সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর এক পুত্র বিনোদলাল ছিলেন ইংরেজী সাহিত্য বিশেষ পারদর্শী। চতুর্থপুত্র শ্যামলালের সাথেও শিল্পকলার ছিলো সুসম্পর্ক। এই শ্যামলালের সাথেই বিবাহ হয় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরীদেবীর। এঁদের ছিলো ৪টি কন্যা-সন্তান-সরল, মনোরমা, কাদম্বরী (কাদম্বিনী) ও শ্বেতাম্বরী। অর্থাৎ, কাদম্বরীদেবী ছিলেন শ্যামলাল ও ত্রৈলোক্যসুন্দরীদেবীর তৃতীয়-কন্যা। এ তো গেল কাদম্বরীদেবীর

শিল্পকলার প্রতি দিকপালদের সৌন্দর্যের উত্তরাধিকারের পারিবারিক ইতিবৃত্ত। এবার আসা যাক, কীভাবে তাঁর ঠাকুরদা' জগমোহন'র ওপর নির্ভর ক'রে হয়ে উঠলেন **'ঠাকুরবাড়ির দারোয়ান'** আর পিতা হয়ে উঠলেন **'ঠাকুরবাড়ির বাজারসরকার'**। শ্রীঘোষ জানাচ্ছেন,

"...জগমোহনের বিচিত্র বলশালীতার কথা বলতে বলতে তাঁর বিপুল শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন,

একবার একদল পুলিশ জবরদস্তি নিয়ে এসে বলপূর্বক আমাদের একটা গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার যোগাড় করছিল—তিনি একলাই সেই গাড়ী ধরে রেখে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

এই প্রসঙ্গেই জগমোহনকে 'সেকালের রামমূর্তি' আখ্যা দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিনি একপ্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বারপাল ছিলেন।'

কোডি রামমূর্তি নাইডু সত্যেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিচারণের সময়ে ভারতবিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বীরপুরুষ।...বোঝাই যাচ্ছে, এহেন উপমায় ভূষিত জগমোহনকে জোড়াসাঁকোর 'একপ্রকার দ্বারপাল' বলায় জগমোহন জোড়াসাঁকোর বেতনভুক দারোয়ান শিউনন্দনের সমপর্যায়ে অবনমিত হয়ে পড়েননি-সেরকম কোনো দুরভিসন্ধি সত্যেন্দ্রনাথের ছিলো না ; বরং বিদেশি শাসকের প্রতিনিধি পুলিশদের অন্যায় জুলুমকে অকুতভয়ে একক শক্তিতে পরাভূত করে জগমোহন-যে জোড়াসাঁকোর দ্বারপালস্বরূপ অর্থাৎ রক্ষাকর্তা প্রহরী হয়ে উঠেছিলেন—সেই প্রশস্তিই এখানে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।"[৭]

এবার আসা যাক কীভাবে কাদম্বরীদেবী'র পিতা শ্যামলাল ঠাকুরবাড়ি'র 'বাজারসরকার' হয়ে উঠলেন সেই কাহিনী'র নেপথ্য ইতিহাসে—

জানা যায় যে, কাদম্বরীদেবী'র ঠাকুরদা' শেষ জীবনে চতুর্থপুত্র শ্যামলাল আর পঞ্চমপুত্র বিহারীলালকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকানাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ও দ্বারকানাথের ভাগ্নে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে কাটান। ঠাকুরবাড়িতে কতটা সম্মানিত জগমোহন ছিলেন, তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। ঠাকুরবাড়িতে তাঁর স্থান যে ছিলো বিশ্বাস, ভরসার আর সম্মানের তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর সেই ভরসা ও সম্মানের উত্তরাধিকার নিয়ে হয়তো 'জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে একটা বাগান তৈরি করা'[৮] ও মুমূর্ষু সারদা দেবীর শয্যাক্ষতের যন্ত্রণা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে air cushion কিনে আনার জন্য'[৯]

শ্যামলাল গাঙ্গুলীকে অর্থ ও পরিচয় -দু'ই দেওয়া হয়। এর থেকেই জনশ্রুতিতে শ্যামলাল হয়ে ওঠেন 'ঠাকুরবাড়ির বাজারসরকার।' আর তাদের মতে অনেক ভাবে যে, ঠাকুরবাড়ি ঘটিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর বিবাহের 'মত-সহ বড় পণ'।[10] তবে অবাক আরও হতে হয় যখন জানা যায় যে, কিন্তু মধুসূদন চিত্র-চেতন-কল্পনা সম্বন্ধে ঘর্ষিত 'সন্তান' ভাবেছেন ই ও 'বাজারসরকার' শ্যামলালের ন শিরোমণিনী ঠাকুরবাড়ির বিয়েতে বহু করেছিলেন এই জেনে।

তবে একটি জনশ্রুতির উল্লেখও এখানে করা দরকার। বলা হয় যে, কাদম্বরীদেবীর পূর্বপুরুষদের পৈতৃক-বাড়িটি ছিল 'খারাপ পাড়া' (হাড়কাটা গলি)-র মধ্যে। কিন্তু শ্রীনাথ আমাদের জানান যে,

"…১৯১৪ সালে…প্রকাশিত পি এন বসু-র কলিকাতা স্ট্রীট ডাইরেক্টরী-র 'কলি পুরনিগম সংস্থান' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতে দেখি হাড়কাটা/হাড়কাটা-গলি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের ১/১-নম্বর বাড়িটি ছিল মহিমচন্দ্রের নবীন বড়ালের ; পরবর্তী ১/৫/১-নম্বর বাড়িটি উমেশ দত্তের বিখ্যাত পত্রিকার কুমারেশ মল্লিকের ; এর পরে ১/৫-নম্বরে থাকতেন কলকাতা-সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা করে অত্যুজ্জ্বল খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পরবর্তী দুটো বাড়ি ১/৬-নম্বর এবং ১/২-নম্বরের মালিক যথাক্রমে 'হারাধন বাড়ুজ্যে' এবং 'সরলা দাসী ও বামা দাসী'; আর এই দুটো বাড়ির পরেই ১/৩-নম্বরে থাকতেন বৌদ্ধ জাতকের বিখ্যাত অনুবাদক রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ…"[11]

তৎকালে হয়তো সেই অঞ্চলে কোন 'খারাপ পাড়া' গড়েই ওঠে নি, সেটি তৈরি হয় অনেক পরে। কিন্তু তাই বলে অবশ্য নিতে হচ্ছে কাদম্বরীদেবীকে জনশ্রুতি-নির্ভর 'খারাপ পাড়ার ঘেঁষা বাড়ির মেয়ে' পরিচয়ে।

তবে সেই একই প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে জগন্মোহনের প্রতি এত শ্রদ্ধা ছিল দেবেন্দ্রনাথ-সহ ঠাকুর-পরিবারের সদস্যদের, সেই দেবেন্দ্রনাথই কেন তাঁর পৌত্রীর সাথে আপন ছেলের বিবাহে খুশি ছিলেন না? আমার ব্যক্তিগত ভাবনা বা ব্যাখ্যা এই যে, হয়তো ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যের সাথে তাই-এর শ্বশুরবাড়ি'র একটা সম্পর্ক চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। হয়তো চেয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ি'র একজন অন্যতম পরিবারের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়িও

অসমমনা পরিচয় থাকুক। ঠাকুরবাড়ির অন্দরে জগমোহন ও তাঁর পুত্রদের যথেষ্ট মান-সম্মান থাক, বাড়ির বাইরের সমাজের অধিকাংশেরই চোখে তাঁরা ছিলেন ঠাকুরবাড়ির আশ্রিত। সেদিক থেকে ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যে অভ্যস্ত সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তি থাকতে পারে। তবে এ সম্পূর্ণ আমার ব্যাখ্যা। আমার ভুলও হতে পারে।

(৩)

শ্যামলাল গাঙ্গুলী'র তৃতীয় কন্যা কাদম্বরী পৃথিবী-বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বধূ হিসেবে প্রবেশ করলেন ৫ জুলাই ১৮৬৮-তে আর ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪ করলেন আত্মহনন। অর্থাৎ, কাদম্বরীদেবী'র সংসার-জীবন (বিবাহিত-জীবন) ও বধূ হিসেবে ঠাকুরবাড়িতে তাঁর স্থিতিকাল ১৬ বছরের মতো। কেমন ছিলো সেই ১৬ (প্রায়) বছর সেই সংসার-জীবন?

ঠাকুর-পরিবারে নারীমহলে পর্দাপ্রথা বা অবরোধ-প্রথা কঠোর ভাবে মানা হতো। স্বর্ণকুমারীদেবী জানিয়েছেন—

"তখন অন্ত:পুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে হইলে ঘেরাটোপ মোড়া পালকীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনও নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পালকী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া আনে।"[১২]

পাশাপাশি জ্ঞানদানন্দিনীদেবী জানাচ্ছেন,

"সেকালে আমাদের অন্দরমহলে এক ছেলেমানুষ-কর্তা পুরনো লোক ছাড়া কেউ আসতে পারত না।...আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ি থাকতেন আমার শাশুড়ীকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা সব শুতে গেলে।"[১৩]

এই অন্দরমহলেই ঠাঁই হল কাদম্বরীদেবী'র। ঠাকুরবাড়ি'র অন্দরমহলের ঘেরা ডিঙিয়ে বাড়ি'র প্রগতিশীলপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীদেবীকে বের ক'রে এনেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে প্রভাবিত হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। স্ত্রী কাদম্বরীকে শেখালেন ঘোড়ায় চড়া। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম...ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা

> বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধ প্রথার সমর্থক নহি,...স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে আমি এতদূর পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গাধারের কোন বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুই জনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম।"[১৪]

অন্তরঙ্গমহলে কাদম্বরীদেবী'র নাম ছিলো হেকেটি। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

> "'চেম্বার্স-বিংশ শতাব্দী' অভিধানে হেকেটি [Hecate গ্রীক বানান Hekate] সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'a mysterious goddess,...having power over earth, heaven, and sea'। আজ একথা বলা সম্ভব নয় কেন অন্তরঙ্গেরা কাদম্বরী দেবীকে রহস্যাচ্ছলে 'হেকেটি' বলে ডাকতেন। বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর ত্রিমুখী প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁরা এই রহস্য রচনা করেছিলেন কি না তাঁরাই জানতেন।"[১৫]

পিতৃবংশের শিল্পকলা-সাহিত্যগুণসুলভ দুর্লভ মনন, উচ্চসংস্কৃতিমনস্কতা ও এক অভিমানী স্পর্শকাতর মন নিয়ে কাদম্বরী অভিজাত ঠাকুরবাড়ি'র আঙিনায় পদার্পণ করেন। বাংলা সাহিত্যের গীতিকবিতার আকাশের ধ্রুবতারা 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী'র তিনি ছিলেন ভক্ত-পাঠিকা। বিহারীলালের সারদামঙ্গল (১৮৭৯)-এর বেশ খানিকটা তাঁর কণ্ঠস্থও ছিলো। মাঝে মাঝে বিহারীলালকে তিনি নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতেন। কাদম্বরীদেবী বিহারীলালকে একখানি আসন উপহার দেন, আর তাতে বিহারীলালেরই সারদামঙ্গল থেকে নিম্নোক্ত অংশ বুনে দেন-

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলুঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?"

ভক্তপাঠিকার প্রশ্নের উত্তর বিহারীলাল দেন সাধের আসন (১৮৮৯)-এ এই ভাবে—

"ধেয়াই কাহারে দেবি নিজে আমি জানি নে।
কবিগুরু বাল্মীকির ধ্যানধনে চিনিনে।"

তবে তখন আর তাঁর এই অন্তপাঠিকা এই ইহলোকে নেই।

কাদম্বরী-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংসার-জীবনের শুরুর দিনগুলি মনে হয় খুব খারাপ ছিলো না। মাঝে মাঝে তাঁরা হাওয়া-বদল করতে বেরিয়ে পড়তেন। চন্দননগরে এমনই এক গঙ্গাধারের বাড়িতে তাঁরা কিছুদিন কাটান। সেটা ছিলো মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি।

পিতৃগৃহের শিল্পকলা-সমৃদ্ধ মনন কাদম্বরী পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ঠাকুরবাড়ি'র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তা আরও বিকশিত হয়ে উঠেছিলো। তেমন সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও তিনিই ছিলেন ভারতী গোষ্ঠী'র অন্যতমা। ধীরে ধীরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনায় ঢুকলেন। স্ত্রী করলেন তাতে যোগ্য সঙ্গত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন *এমন কর্ম আর করব না* (১৮৭৭)-র নায়িকা হেমাঙ্গিনী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন কাদম্বরীদেবী আর নায়ক অলীকবাবু'র ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু হঠাৎ তাল কাটল দৈনন্দিন এই সুখী দাম্পত্যের। ১৯ এপ্রিল (১৮৮৪)-এ আত্মহত্যা করেন কাদম্বরীদেবী । এই আত্মহত্যার সাথে ২টি মৌলিক প্রশ্ন জড়িত—

১. কীভাবে?

২. কেন?

'কীভাবে?' প্রশ্নের উত্তর পাই শ্রীমতী সুনয়নীদেবী'র কাছে। তিনি জানাচ্ছেন—

"আর একদিনের কথা মনে আছে। যেদিন জ্যোতিকাকার স্ত্রী কাদম্বিনী (কাদম্বরী) দেবী মারা যান। আপনারা জানেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কারণটা আমরা ঠিক জানি নে। তবে শুনেছি জ্যোতিকাকার সঙ্গে তাঁর কি নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল। সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে এক কাপড়ুনী প্রায়ই কাপড় বেচতে আসত। তার নাম ছিল বোধ হয় বিশু। তাকে টাকা দিয়ে তিনি লুকিয়ে আফিম আনান-তাই খেয়ে আত্মহত্যা করেন।...পরে পুলিশ এসে সেই মৃতদেহ নিয়ে যায় এবং ময়নাতদন্তে পাকস্থলিতে আফিম পাওয়া যায়।"[১৬]

তারপর দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা, করোনার কোর্ট-সংক্রান্ত বিষয়--এগুলি প্রায় সকলেরই জানা।

কিন্তু তার পরেই প্রশ্ন আসে, কেন এই আত্মহত্যা? এর জন্যে বোধহয়

সব থেকে বেশী দায়ী করা হয় রবীন্দ্রনাথকে। তারপরেই আসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম।

রবীন্দ্রনাথ বিবাহ করলে কাদম্বরী'র তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা জগৎ চুরমার হয়ে যায়। ফলত, কাদম্বরীকে বাঁচতে মৃত্যু'র আশ্রয় নিতে হয়। দু'জনের সম্পর্ক ঠিক কতটা 'ব্যক্তিগত স্তর'-এ পৌঁছালে একজনের বিবাহ অপরজনের মৃত্যু'র কারণ হয়ে ওঠে, রবীন্দ্র-কাদম্বরী'র সম্পর্কের চরিত্র কি তাই ছিলো? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অভিমত- না। হতে পারে কাদম্বরীদেবী'র নিঃসঙ্গ-নিঃসন্তান জীবন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ করেছিলেন সাহচর্যে, ভ্রাতৃত্বে ও বন্ধুত্বদানে ; হতে পারে 'বিবাহিত' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে হয়তো পূর্বের মতো সাহচর্য না পাওয়ার একটা আশঙ্কা কাদম্বরী'র মনে ছিলো, কিন্তু প্রশ্ন জাগে বিবাহ-পরবর্তী জীবনের পরিবর্তনের বিষয়ে কী কাদম্বরীদেবী অবহিতা ছিলেন না? এইটুকু বোঝার মতো কী তাঁর মানসিক পরিপক্কতা ছিলো না? মনে হয় তা নয়। পাশাপাশি আর একটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখ করবো। বিদগ্ধ সমাজে একটি মত প্রচলিত আছে। সেটি হল—সদ্য বিবাহিত' (রবীন্দ্র-মৃণালিনী'র বিবাহ হয় ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের রচিত ২টি পংক্তি কাদম্বরীদেবীকে না কি নীরবে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে ছিলো। সেগুলি হ'ল—

"হেথা হতে যাও, পুরাতন
হেথায় নতুন (নূতন) খেলা আরম্ভ হয়েছে।..."

ভাবা হয়, রবীন্দ্রমননের এই ভাবনা ছিলো কাদম্বরীকেন্দ্রিক। তবে দিন-কালের হিসাব কিন্তু অন্য কথা বলে—

"...এই দু-লাইন আসলে ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ (১৯ এপ্রিল ১৮৮৪) কাদম্বরীর মৃত্যুবরণের প্রায় এক বছর পর, ১২৯১ বঙ্গাব্দের চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল ১৮৮৫) মাসের ভারতী পত্রিকার ৫৪৪-৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৫৯ পংক্তির 'বিদায়' নামক কবিতার প্রথম দুই পংক্তি। ভিন্ন স্তবকসজ্জায় (ফলত ৫৯ পংক্তি থেকে ৪০ পংক্তিতে) এবং অনেকাংশে ভিন্ন শব্দচিত্রসমূহে সম্পাদিত হয়ে এই কবিতা 'পুরাতন' নামে ১৮৮৬ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত কড়ি ও কোমল কাব্যে সংকলিত হয়।"[17]

কাদম্বরীদেবী'র আত্মহত্যার নেপথ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতটা দায়ী ছিলেন? এই প্রসঙ্গে চিত্রা দেবের *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* গ্রন্থ থেকে ২টি অংশ তুলে ধরতে চাই—

১. "কাদম্বরীর যে সব খবর পাওয়া গেছে তাতে নিশ্চিত উত্তর কিছু পাওয়া যায় না। ইন্দিরা আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'জ্যোতিকাকামশাই প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না। তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল বির্জিতলাওয়ে আমাদের বাড়ি। আমার মা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল।' এরই মধ্যে একদিন অভিমানিনী কাদম্বরী স্বামীকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। গানে গানে আড্ডায় আড্ডায় সেদিন এত দেরি হয়ে গেল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাড়ি ফেরাই হল না। প্রচণ্ড অভিমানে কাদম্বরী ধ্বংসের পথই বেছে নিলেন।"[১৮]

২. "আবার স্বর্ণকুমারীকে প্রশ্ন করে অমল হোমও শুনেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জোব্বার পকেট থেকে কাদম্বরী পেয়েছিলেন তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর মতান্তরে নটী বিনোদিনী'র কয়েকখানি চিঠি। চিঠিগুলি উভয়ের অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক। এই চিঠিগুলি পেয়ে কাদম্বরী কয়েকদিন বিমনা হয়ে কাটান তারপর আত্মহত্যা করেন।...কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন যে, তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, 'যে মহিলার সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী নন, তবে সেই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী না কি আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন'।"[১৯]

নাটকের সাথে যুক্ত ২জন নারী'র সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিবিড় যোগাযোগের কথা প্রচলিত আছে—বিনোদিনী বা নটী বিনোদিনী আর গোলাপসুন্দরী। নটী বিনোদিনী'র সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পর্কের নিবিড়তার কোন যথার্থ সত্যতা ছিলো কি না জানি না, তবে একটি প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরতে চাইব। বিনোদিনী'র আমার কথা-র 'নিবেদন' অংশে তিনি লেখেন যে, তাঁর শিক্ষাগুরু গিরিশচন্দ্র এই আত্মকথার একটি ভূমিকা লিখে দিলেও সেইটি বিনোদিনী'র 'মনের মতন' হয়নি। তার কারণ জানিয়ে তিনি বলেন,

"আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না।...সত্য ঘটনা সকল উল্লেখ করিয়া আর একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম।"[২০]

অর্থাৎ, এর থেকে স্পষ্ট নিজের লেখায় তিনি সত্যধর্ম বজায় রাখতে

চেয়েছিলেন। মূল গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে তাঁর কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় না (যদি চোখ এড়িয়ে না যায় আমার)। সমগ্র আমার কথা-য় তিনি একবারই (সম্ভবত) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন এইভাবে-

"সে সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের অশ্রুমতি ও সরোজিনী নাটকের অভিনয় হয়েছিল। সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত।"[২১]

যদিও উক্ত গ্রন্থে কোন-এক পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁর সাথে বিনোদিনী সুখে কাল কাটান দীর্ঘ ৩১ বছর এবং ১৩১৮-র ১৪ই চৈত্র বুধবার 'কাল-কালে' সে 'আশাটুকু গেল।'[২২] অর্থাৎ

"তাঁর (বিনোদিনী) আশ্রয়দাতা মহান পুরুষটির মৃত্যু হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই চৈত্র- খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ১৯১২ সালের ২৭ মার্চ।...১৯১২ সালে সমাপ্ত তাঁর দাম্পত্যের বয়স ৩১ বছর বলায় এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, ১৮৮১-৮১ সালেই বিনোদিনীর এই দাম্পত্য শুরু হয়েছিল...১৮৮১ কিংবা ১৮৮২ যে-সালেই ওই সম্পর্ক সূচিত হোক না কেন, একে মেনে নিলে ১৮৮৪ সালে কাদম্বরীর পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জোব্বার পকেটে আর যারই হোক অন্তত বিনোদিনীর প্রেমপত্র খুঁজে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।"[২৩]

পাশাপাশি শ্রীঘোষ গোলাপসুন্দরী বা সুকুমারী'র জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এটা উল্লেখ করেন যে,

"...১৮৭৭ সালে অগত্যা তাঁকে মঞ্চে ফিরতে হয়েছে বটে, কিন্তু সন্নিহিত সময়ে তিনি যে কোন পুরুষের রক্ষিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি বরং ১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে, অর্থাৎ কাদম্বরীর আত্মহত্যার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরগুলিতে সুকুমারী এমন কী মঞ্চেও অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর মেয়েটিকে মানুষ করে তোলার ব্যস্ততায়।"[২৪]

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছিলো যে, ভক্তপাঠিকার অকাল প্রয়াণ শোকাতুর করেছিল বিহারীলালকে। তাই তিনি তাঁর সাধের আসন (১৮৮৯)-এ কাব্যে মুখর হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"কেন মা পৃথিবী আসি
শুখায় সুখের হাসি।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
কই তোর প্রফুল্লতা?
কে ছিঁড়েছে আশালতা? কি মানে মানিনী গো? ১০/৭।।

... ...

এস না ধরায়- আর এস না ধরায়।
পুরুষ কিস্তুতমতি চেনে না তোমায়।
মন: প্রাণ যৌবন-
কি দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।
এস না ধরায়।১০/৯।।"[২৫]

বিহারীলালের এই রচনাংশটুকু অনেক-কিছু'র সাক্ষী দেয়। যেমন—

১. বিহারীলাল-কাদম্বরী'র সম্পর্কের স্বরূপ/বিহারীলালের চোখে কাদম্বরী—'মা'

২. কাদম্বরীদেবী'র বিবাহিত জীবনের অ-সুখ—

ক. 'শুখায় সুখের হাসি।'

খ. 'কই তোর প্রফুল্লতা?'

৩. কাদম্বরীদেবী'র চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য/রবীন্দ্রনাথের অভিযুক্ততা থেকে মুক্তি- 'সতী সাধ্বী পতিব্রতা'

৪. কাদম্বরী'র অভিমানিনী মনের সাক্ষ্য—'কি মানে মানিনী গো?'

৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (?)—

ক. 'পুরুষ কিস্তুতমতি চেনে না তোমায়।'

খ. 'পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।'

তবে প্রভাতকুমার কিন্তু অন্য কথা বলেছেন—

"কাদম্বরীদেবীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে লোক বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। আমাদের যতদূর জানা আছে তাহা মহিলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণাম।"[২৬]

(৪)

এবার রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কের প্রকৃতি খুঁজে দেখা যাক রবীন্দ্রনাথকেই অবলম্বন ক'রে। মূলত তাঁর দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *জীবনস্মৃতি* (১৯১২) ও *ছেলেবেলা* (১৯৪০)-য় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সম্বন্ধে যা যা বলেছেন, আমার কাছে তার থেকে বড় সত্য আর কিছু নেই। মূলত এখানে রবীন্দ্রনাথের হাতে কাদম্বরী বর্ণিত হয়েছেন কোনরকম রূপক-প্রতীকের আবরণ ছাড়াই।

এই প্রসঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় একটু উল্লেখ করতে চাইব। কাদম্বরীদেবী'র জন্ম ৫ জুলাই ১৮৫৯ সালে আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম ৭ মে ১৮৬১। অর্থাৎ মোটের ওপর উভয়ের বয়সের পার্থক্য ২ বছরের কাছাকাছি। বয়সের এই নৈকট্যে বন্ধুত্ব হওয়া স্বাভাবিক, স্বাভাবিক উভয়ের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক হওয়াটাও।

রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদাদেবী পরলোক গমন করেন ২৫ শে ফাল্গুন ১২৮১ সনে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩ বছর ১০ মাস। মাতৃহারা রবি'র কাছে কাদম্বরী ধরা দিলেন তখন মাতৃরূপে—

> "মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।...যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।' তখনই বৌঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়ে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল।"[২৭]

মাতৃসম সতর্কতায় এ হল সন্তানসমদের মানসিক আঘাত থেকে আগলানো। এবার দেখব তাঁর মাতৃরূপে দেবরদের বুকে তুলে নেওয়ার বর্ণনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কলমে; আর বলাই বাহুল্য, এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অন্যতম—

> "বাড়ির যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোন অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন।"[২৮]

যদি খুব ভুল না করি তবে এই 'সৌন্দর্যলক্ষ্মী' আর 'শশীর' কবিতার দুটি আর কেউ নন, স্বয়ং কাদম্বরীদেবী। মনে রাখতে হবে সন্ধ্যাসংগীতের সৃষ্টির সময় কাদম্বরীদেবী'র বয়স সবেমাত্র ১৮-র মধ্যে। অতএব এই বয়সটি তাঁর মাতৃত্ব মনস্তত্ত্বকর। আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ২১-র মধ্যে। যৌবনের শুরুতে পৌঁছোবার আগে প্রথম সোপানে দাঁড়িয়ে যৌবন কাটিয়ে আসা রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর সম্পর্কে মনের যে পবিত্র মাতৃভাব পোষণ করতেন, উপরোক্ত কবিতা দুটি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

ছোট্ট রবি বড় হলেন। কাদম্বরী তাঁর কাছে প্রতিভাত হলেন নতুন রূপে—যেন কোন সৌন্দর্যলোকের দেবী, যিনি সর্বদাই 'সৌন্দর্যের বীজের' অন্তরাত্মায় সৌন্দর্যের বীজ বপন করলেন নিজের হাতে—

"এতদিন গোলাবাড়ি, পালকি আর কোনো কোনো ছাদের কোণ ছিল আমার খেলার জায়গা। বউঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।"[১২]

আবার কখনও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"ছাদটাকে বৌঠাকরুণ একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিলের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলন-চাঁপা। ছাদ জখমের কথা মনেই আনেননি, সবাই ছিলেন খেয়ালী।"[১৩]

এই বৌঠাকরুণের থেকেই রবীন্দ্রনাথ শিখেছিলেন রূপরস-প্রেমের প্রথম পাঠ, দেখেছিলেন কাকে বলে প্রেমকাব্যিকতা—

"দুপুর বেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নিচের তলায় কাছারিতে। বৌঠাকরুণ ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রূপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপর ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠান্ডা করা।

সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ আর কাদম্বরীদেবী যেন ছিলেন ছোট্ট ছোট্ট দুটি পাখিবোন ; যারে

মাঝেই ফিরে যেতেন শৈশবে, চলত শিশুসুলভ কর্মকাণ্ড, রাগ ও মান-অভিমান—

"...বৌঠাকরুনের জায়গা হোলো বাড়ির ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরি হোলো পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে, নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলে-মানুষ। বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয় বাড়িতে যেতেন , ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতো জোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা কোন দামী জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়া শুরু করতুম। বলতে হোত, তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার। তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না নিজের হাত সামলিয়ো।"[৩২]

কখনও কখনও দেবর-ভ্রাতৃবধূ'র চির পরিচিত ঠাট্টা-তর্ক-খেলাধুলোয় মাততেন কাদম্বরীদেবী ও রবীন্দ্রনাথ। তবে এতে যে বুদ্ধিমতী বৌদিদি'র কাছে দেবরের হার হত বরাবর, তা কবি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন—

"তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বারবার হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না, আর হেরেছি দাবা খেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।"[৩৩]

আবার এই ছোট্ট দেবরটির প্রতি কাদম্বরী'র মাতৃভাবটি ছিলো সর্বদা বজায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"...মনে পড়ে পৈতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন বেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি, ঐ তিনদিন তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।"[৩৪]

রবীন্দ্র-কাদম্বরী'র সম্পর্কের বিমলত্বের এবার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

"বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধা ছিলো কাড়াকাড়ি করবার দরকার হোত না, কেন না আমার একটা গুণ ছিল আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজলি পাখা ছিল না,

পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা অংশ দাবি আদায় করে নিতুম।"[৩৫]

স্নেহের দেওরটির লেখার অদ্ভুত ক্ষমতা বৌঠানের চোখ এড়ায় নি। তাই আঘাত-ঈর্ষার ঘর্ষণে তা আরও ক্ষুরধার করার প্রয়াস তিনি চালিয়ে গেছেন—

"...আত্মীয়েরা বলতেন ছেলেটির লেখার হাত আছে। বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উল্টো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলি খোঁটা দিয়ে বলতেন কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না।..."[৩৬]

কিশোর দেবরটি তাঁর কপট অভিনয় ধরতে পারেন নি। কিন্তু এই স্মৃতিচারণকালে তা পরিণত কবি'র বোধের অগম্য ছিলো না। তরুণ স্নেহের দেবরটির সাহিত্য-প্রতিভা ও গুণের পরিচয় পদে পদে পেয়েও কাদম্বরী হয় রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন 'খোঁটা', নয়তো থেকেছেন নীরব। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন দেবরটির প্রতিভা আরও উন্নত হোক। পাশাপাশি তাঁর প্রশংসায় স্নেহের দেবরটি যদি পথভ্রষ্ট না হন আত্মতুষ্টিতে, সেই দিকেও ছিলো তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণায় বলেছেন, "...বৌঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন।"[৩৭]

পরিণত বয়সে জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার নানা স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও বৈঠকী। তবু তাঁর বর্ণনার কিছু অংশকে যদি প্রতীকায়িত ধরি, তবে সেগুলি ভিন্ন তাৎপর্যে ধরা দেয়—

১. "...মাতৃহীন বালকদের ভার নইলেন" (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-২৮)

২. "...বৌঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল 'দেখা'" (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-২৯)

৩. "...ছাদ জখমের কথা মনেই আনেননি" (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৩০)

৪. "...কেটে কেটে যত্ন করে..." (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৩১)

৫. "...সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে..." (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৩১)

নিজের ও কাদম্বরীদেবী'র কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া সম্ভ্রম বজায় রেখেছেন, বর্জন করেছেন অতিকথন। বর্ণনায় কাদম্বরীদেবী কখনও

পেয়েছেন মাতৃরূপ, কখনও সহোদরা-রূপ, কখনও সখীরূপ, আবার কখনও পেয়েছেন প্রেমদাত্রী'র আসন। নতুনবৌঠানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ এক-ধরণের নির্ভরতা।

(৫)

১৯ এপ্রিল ১৮৮৪। মরজগতের মায়া হয়তো কাটাতে পেরেছিলেন বলেই একবুক জ্বালা নিয়ে আত্মহনন করেছিলেন কাদম্বরীদেবী। কিন্তু সত্যি-ই কি মায়া কাটাতে পেরেছিলেন? কেন বারবার তিনি ঘুরে-ফিরে আসতেন ভ্রাতৃপ্রতীম প্রিয় দেবরটির প্রেতচক্রে? রবীন্দ্রনাথের প্রেতচক্রে বিদেহী কাদম্বরী'র আগমন—

- ৪ নভেম্বর ১৯২৯ :

  "কে?

  —নাম জিজ্ঞাসা কোরো না। তুমি মনে যা ভাবছ, আমি তাই।"[৩৮]

- ২৮ নভেম্বর :

  "কে?

  —এখন তো সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু এখন তো আসব না জানো।"[৩৯]

- ২৯ নভেম্বর (বিকেল) :

  "কে? কী নাম?

  —আমি একটি কথা বলে চলে যাব। জানি কিছুকাল তোমার কাছে আসা সম্ভব হবে না।..."[৪০]

- রাত :

  "কে?

  —কূলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলুম, আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।

  তুমি নাম বলবে না?

  —না।

  একটা কবিতা লিখে দেবে?

  —আমার বিদ্যে কি অজানা?

  আমি তোমার কথা শান্তিনিকেতনে অনেকবার ভেবেছিলুম। আমার শরীর ভালো ছিল না। তখন তোমায় ভেবেছি? তুমি জানতে?

—জানি। আমি আসতে পারিনি। মনে মনে এসেছিলুম। কেমন করে বোঝাব।... শেষ রাত্রে শিশিরে হাওয়ায় তুমি যখন গায়ের কাপড়টা টেনে নিলে, আমি এসেছিলুম তখন।

আমি তোমাকে মনে মনে বলছিলুম একদিন যে, আমার অসুখ করেছে। তুমি যদি এসে থাক আমায় একটু সেবা করে যাও।

—তুমি চাও, কিন্তু ভাল করে সেবার মতো শক্তি তো আমার নেই। তাই বড় অভাব বোধ হয়। তোমাকে কী মুশকিলে ফেলেছি।"[৪১]

এবার কথোপকথনগুলির দিকে নিবিষ্ট চিত্তে একটু নজর দেওয়া যাক। উল্লিখিত কথোপকথনে কাদম্বরীদেবী কখনই নিজের নাম রবীন্দ্রনাথকে বলেন নি। হয়তো তাঁর বিশ্বাস ছিলো, স্নেহের ও বড় কাছের দেবরটি তাঁর এই অ-নাম থেকেই তাঁকে চিনে নিতে পারবে (ন)। আর বলা বাহুল্য, বাস্তবে তা ঘটেওছিলো। একটি কথোপকথনে তো কাদম্বরীকে দেখা যায় যে, তিনি যে কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারবেন না সেই সংবাদটি দিতে তিনি এসেছেন (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৪০)। এ যেন স্নেহের দেবরটির কাছে বৌঠানের আদরের জবাবদিহি। নভেম্বর রাতে বিদেহী কাদম্বরী'র সাথে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন (তথ্যসূত্রসংখ্যা-৪১) থেকেও কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়—

ক. বৌঠানের কাছে দেবরের শিশুসুলভ আব্দার (একটি কবিতা)।

খ. উত্তরে (মনে হয় কাদম্বরী নিজে কোন সাহিত্য রচনা করেন নি তাই) এ বিষয়ে 'বিদে' নেই তা জানা সত্ত্বেও দেবরের আব্দার করায় অনুযোগ, যা আন্তরিকতার পরিচায়ক।

গ. মাতৃসমা বৌঠানের উদ্দেশ্যে অসুস্থ দেবরের সেবা পাওয়ার আকুতি ও বিদেহী বৌঠানের তা দিতে না পারায় মনঃকষ্ট। বিদেহী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনেও এসেছে কাদম্বরী-প্রসঙ্গ :

১. "নতুন বৌঠানের সঙ্গে দেখা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, 'তোমার নতুন বৌঠান সমভাবেই আছেন। আমি শুধালাম, পৃথিবীর প্রতি তাঁর কি আকর্ষণ আছে? তিনি বললেন, 'আছে, সেই জন্যেই তো দেখা হয় না।' আমি বললুম, 'আমি এখনো তাঁকে ভুলতে

পারিনে—কেননার সঙ্গে মনে পড়ে।' তিনি বললেন,' জানি, তোমার নতুন বৌঠানকে আমি বলব।"[৪২]

২. (কাদম্বরী'র ভাই-এর আহ্বানে ভাইকে প্রেরণ)

"কে?

—পাঠিয়ে দিলেন তোমার নতুন বৌঠান।"[৪৩]

৩. (বিদেহী কাদম্বরী'র দেহধারণগত-ইচ্ছা-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা)

"নতুন বোঠানকে বলেছিলুম দেখা দিতে। চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। পারবেন?

—তার শক্তি যে কতদূর, তা তো জানিনে। তবে খুব একটা ইচ্ছাশক্তি তোমাকে প্রয়োগ করতে হবে।"[৪৪]

(তথ্য-সূত্র : ২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কাদম্বরী-সংক্রান্ত কোন আবেগ লুকিয়ে রাখেন নি, বরঞ্চ প্রিয় দাদা'র কাছে তা করেছেন ব্যক্ত। তাঁকে ভুলতে না পারার যন্ত্রণা যে রবীন্দ্রনাথকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, তা তিনি ভ্রাতাকে জানিয়েছেনও। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তা শুনে সাগ্রহে জানিয়েছেন যে, তিনি তা তাঁর স্ত্রীকে জানাবেন। রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কে সামান্যতম পঙ্কিলতা যদি থাকত, তবে দুই সহোদর কি এভাবে কাদম্বরী সম্বন্ধে বাক্যালাপ করতে পারতেন?

এবার আলোচনার একেবারে শেষলগ্নে এসে কাদম্বরীদেবী'র বিদেহী আত্মার বলা কথাগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাক, কারণ,

কথার ভেতরেই তো মানুষটিকে পাওয়া যায়—

ক. কাব্যধর্মীতা : "কূলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলুম, আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।" (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৪১)

খ. আঞ্চলিকতা : 'ভাসিয়েছিলুম', 'এসেছিলুম' (তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৪১)

গ. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. স্বরসঙ্গতি—'বিলে' (<বিলা) [তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৪১]

২. ব-শ্রুতি—'দেবার' (<দেওয়ার) [তথ্যসূত্র-সংখ্যা-৪১]

মা, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ, সহোদরা, অনুপ্রেরণাদাত্রী, সখী—বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এইসব ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাদম্বরীদেবী ধরা দিয়েছিলেন। দেহী বা বিদেহী, যে-কোন রূপেই রবীন্দ্রনাথের কাছে এলে যে তাঁর স্নেহের দেবরটি তাঁকে

দিনে দিনে আমাদের (ম), তাদের বোনদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাই ছিলো তাঁর, একদিকে ছিলো তাঁদের দুজনের আস্থার বন্ধন। আর তাই তো রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান, তাঁর বৌঠাকরুন, শ্রীমতী হে-কাদম্বরীদেবী রবীন্দ্রনাথকে বলতে পেরেছিলেন একবুক বিশ্বাস নিয়ে—

> "...তুমি আমার খেলনা ঠিক দিবে। আমার ভালোটা আজও আছে, প্রাণ আছে শেষ নেই অব্দু।"[৪৫]

তথ্যসূত্র :

১. মনোরঞ্জন ঘোষ, কবিমানসী ও সামাজিক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা, ২০১৭, পরম্পরা, কলকাতা, পৃ. ৪৪
২. হীরা প্রতি পত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুরাতনী, জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৯
৩. মনোরঞ্জন ঘোষ, কবিমানসী ও সামাজিক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা, ২০১৭, পরম্পরা, কলকাতা, পৃ. ৭০
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ২০০৯, বিদ্রোহী পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪৩
৫. হীরা প্রতি পত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুরাতনী, জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৯
৬. মনোরঞ্জন ঘোষ, কবিমানসী ও সামাজিক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা, ২০১৭, পরম্পরা, কলকাতা, পৃ. ৬৮
৭. তদেব পৃ. ৬২-৬৩
৮. তদেব পৃ. ৭০
৯. তদেব পৃ. ৭০
১০. তদেব পৃ. ৭০
১১. তদেব, পৃ. ৬৫
১২. 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার', প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬, জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩৪
১৩. পুরাতনী, জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩৪
১৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩৮
১৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪০

১৬. শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ উৎসবে শরৎচন্দ্রের ভাষণ : 'কবিবর জন্মদিনে', জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৭০-২৭৪
১৭. [illegible] ঘোষ, কবিমানসী ও সাময়িক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা, ২০১৭, পত্রলেখা, কলকাতা, পৃ. ৭৮-৭৯
১৮. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৭৮
১৯. তদেব, পৃ. ৭৯
২০. নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদক), বিনোদিনী দাসী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, ১৩৭৬ (ব.), সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ২
২১. তদেব, পৃ. ১০৪
২২. তদেব, পৃ. ৭৫-৭৬
২৩. [illegible] ঘোষ, কবিমানসী ও সাময়িক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা, ২০১৭, পত্রলেখা, কলকাতা, পৃ. ১১২-১১৩
২৪. তদেব, পৃ. ১১২
২৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী, প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য, ১৩৬৯ (ব.), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪৮
২৬. পাদটীকা, 'শোক ও সান্ত্বনা', রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭ (বোলপুর)
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ২০০৯, মিত্রশ্রী পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১৩৮
২৮. তদেব, পৃ. ১৩৮
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, ১৩৪৭ (ব.), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, পৃ. ৫৮
৩০. তদেব, পৃ. ৫৬
৩১. তদেব, পৃ. ৬৮-৬৯
৩২. তদেব, পৃ. ৫১-৫২
৩৩. তদেব, পৃ. ৫৯
৩৪. তদেব, পৃ. ৭১
৩৫. তদেব, পৃ. ৬৯
৩৬. তদেব, পৃ. ৬২
৩৭. তদেব, পৃ. ৭০
৩৮. অমিতাভ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের পত্রলেখাবলী, ২০০১, পুঁথি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৬৮

CONTENTS

চাঁদ বণিকের পালা : নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে—ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 7

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও কৃষক সমাজের ভাষা—ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা 17

ঈশ্বরকথা—ড. কুশল চাটার্জী 33

শ্রীমতী হে'—ড. কুশল চাটার্জী 43

রবীন্দ্রমননে হিন্দুমুসলিম-ভাবনা ও সম্প্রীতিবোধ—ড. কুশল চাটার্জী 66

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভিন্ন দৃষ্টিকোণের আঙিনায়—অপূর্ব নন্দী 80

শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব—অভিজিৎ মণ্ডল 89

"ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশে দার্শনিক সংহতি ও একত্ব ভাবনা"—অভিজিৎ মণ্ডল 98

বাণভট্টের রচনায় চিত্রিত সমাজজীবন—অভিজিৎ মণ্ডল 112

संजीव की कहानियों में नारी—डॉ. कलावती कुमारी 117

मातादीन चाँद पर कहानी में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था—डॉ. कलावती कुमारी 128

प्रेमचंद और स्त्री : परंपरा बनाम आधुनिकता—डॉ. कलावती कुमारी 134

फैज अहमद 'फैज' और दुष्यंत कुमार की गजलों में हिंदुस्तान की छवि —डॉ. सुनीति साउ 145

People on the margins in the stories of Bibhutibhushan —Chandranath Adhikari 149

Portrayal of Human Life in the select Poems of Jayanta Mahapatra—Anindya Chakraborty 153

UNDERSTANDING RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005—Dr. Santosh Kumar Tunga 163